

ইসলাম ।

“ফাঙ্কুরু লী আজ্জুরু কুম্ ও-অ'শ্'কুরু লী ও-আলা
তা'ফু'রু'নি” (বকরা (২)-১৫২), “অতএব আমাকে
শ্রবণ কর, আমি তোমাদিগকে শ্রবণ করিব,
এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, ও
বিরুদ্ধাচারী হইও না ।”

শ্রীযুত বিজয়দাস দত্ত প্রণীত ।

মূল্য ১।০ দেড় টাকা মাত্র ।

হিন্দু-মুসলমান বিরোধের কোরাণ-প্রদত্ত অন্যর্থ মহোষধি ।

বিগত ২৯শে আগষ্ট (১৯২৭) বড়লাট তাঁহার বক্তৃতায় বলিতেছেন, যে “ভারত স্বরাজ লাভ করিতে চাহিতেছে, এবং বিলাত ও ভারতের সেই লক্ষ্য যাহাতে সিদ্ধ হয়, তাহার সাহায্য করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছি” । সে সঙ্গে তিনি ইহাও দেখাইয়াছেন, যে বিগত “আঠার মাসের ও কম সময়ে হিন্দু-মুসলমানের সংগ্রামে ২৫০ কি ৩০০ লোক হত, এবং ২৫০০ লোক আহত হইয়াছে ।” ১৯১৯ সনের স্বরাজ-প্রতিশ্রুতির পূর্বে ত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এরূপ বিবাদ ছিল না ! সেই স্বরাজ প্রতিশ্রুতিই কে দেশকে জনসাধারণের শাসন হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য রাজনৈতিক কূটচক্রীদের হাতে পরিয়া, বর্তমান বিবাদের কারণ, “apple of discord” হইয়াছে ? হিন্দু-মুসলমান বিরোধের নিরূপণ ভিন্ন স্বরাজ লাভ অসম্ভব । এ বিরোধ-রোগের ঔষধ কি ?

কোরাণ আমাদের প্রব্লেম উত্তরে ঔষধ বলিয়া দিতেছে । হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া সে ঔষধ সেবন কর । কোরাণ হজরত মহম্মদকে কাফের বা ঈশ্বরে অবিশ্বাসীদের সঙ্গে মিলিয়া একত্রে উপাসনা করিতে বলিতেছে, “ও-আ এজা কুনুতা ফী হিম্ ফা আকামতা লাহমুস্ সালাতা” ইত্যাদি, নিসা (৪) : ১০১, ১০২ । “এবং (হে মহম্মদ) যখন তুমি অবিশ্বাসীদের মধ্যে থাক, এবং তাহাদের উপকারের জন্য তুমি উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখ, তাহাদের একদল যেন তোমাদের সঙ্গে নমাজে দাঁড়ায়” ইত্যাদি (পৃ: ৯৪) । একালের মুসলমানেরা যাহারা নিজেরাই নমাজের অর্থ বুঝে না, তাহাদের নিকটে সেরূপ আশা করাও ছুরাশা ! কোরাণ উপাসনার সম্বন্ধে আরও বলিতেছে “উংলু মা উহিয়া ইলাইকা মিনাল্ কিতাবে ও-আ আকিমেস্ সালাতা । ইরাস্ সালাতা তান্হা আনেস্ ফাহ্ শায়ে ও-আল মুনকারে”—

ইসলাম ।

(সম্মিলিত হিন্দু-মুসলমানের জন্য)

“হাদীসে ইয়াহুদে ট-ন ল্ ক-টোলা ফা ইয়াতাবে-টোনা আই-
সান ল্ টোলা-একা হাদীসে হাদীসে ল্লাহো, ও-আ উলাএকা
কম টোলু ভালবানে ।”..... “ও-আ হাদেট তাইসানা মা
টুনেলা এলাইকুম স্মিন্ বাককুম” । জুমা (৫২)–
১৮.৫৫ “যাওয়ারা বর্ণী শ্রবণ করে, এবং তৎপর
তন্মধ্যে যাহা টেকুসে, তাহার অনুসরণ করে,
তাঁহারাষ্ট যাও লীগকে ও বশেষর তনুপ্রাপিত
করিয়াছেন, এবং তাঁহারাষ্ট যাওরা বুদ্ধিমান” ।
..... “এবং তোমার পুতু হইতে
তোমার নিকটে যাহা প্রকাশিত
হইয়াছে, তন্মধ্যে যাহা সর্বেবাৎকুসে,
তাঁহার অনুসরণ কর” ।

শ্রীযুত দ্বিজদাস দত্ত প্রণীত ।

মূল্য ১।।০ দেড় টাকা মাত্র ।

ভূমিকা

আজ কালের হিন্দু-মুসলমানের বিন্দব দেখিয়া কোন প্রকৃত হিন্দু বা কোন প্রকৃত মুসলমানের না হৃদয় বিদীর্ণ হয় ! হিন্দু-মুসলমানের মতাদর্শ আত্মসম্বন্ধে পূর্বে ভেদের বা বিবাদেই কাঙ্ক্ষিত ছিল। মুসলমানের হাতে খাটলে, কি মুর্গি কি গো-মাংসাদি খাটলে পূর্বে হিন্দুর জাতি যাউত, হিন্দু মুসলমান হইয়াছে, নলা হইত। কিন্তু মুসলমান বাবুর্চির হাতে খাওয়া, মুর্গি খাওয়া, এমন কি বিলাসিত গিয়া গোমাংস ভক্ষণ, এমন কি সেনার মত শীষ্টান মতে মমু সাদি কনাও এখন হিন্দুর পচলিত আচারের মতাদর্শ পাগা হইতেছে। এখন তবে হিন্দু-মুসলমান হৃদ না বিবাদ কি লইয়া ? ভাউ হিন্দু, ভাউ মুসলমান, তেমননা কি এখনও একথা ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিব না ? ধর্ম্মের মতাদর্শ যাউ সাময়িক (মুতাশাবেহাতুন), তাহাকে কি যাউ মিতা (মুহকামাতুন) তাহা হইতে পৃথক করিব না ?* কলমা পড়া, নমাজ পড়া, দরিদ্রার্থে জকাতে দান করা — এইত মুসলমান ধর্ম্মের চিরস্থান ভিত্তি। এই 'ইসলাম' গ্রন্থে আমরা হিন্দু-মুসলমান টভয়কে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, এ সকল কি। এ সকলের অর্থ বুঝিলে পর, কোন প্রকৃত হিন্দু কখনো বলিবনা, যে কলমা পড়িলে, কি নমাজ পড়িলে, কি জকাতে দান

* সুবা ইমরান (৩)-৬।

করিলে, হিন্দুর জাতি যায়। এবং এ সকল পুস্তক নিঃসৃত "মুহু-
কামাতুন" ইসলাম। কোন বস্তু-নিরূপণ কত গায়া, কি গায়া না।
অতএব সে মুসলমান, এমন কথা কোন মুসলমানের বক্তা
সাধে না। নিরাশিমাশি মুসলমানের দুঃখ। উক্তদ্বারা
কি প্রমাণিত হইতেছে না, যে একজন সাদ্বিক অতি নিষ্ঠুরতা
হিন্দু ও তাহার হিন্দুই যোগ আনা আটটি বক্তা করিয়া মনোজ-
ভকাৎ-রোজাদি করিয়া এমন কি বাকদির গায়াগীত সম্বন্ধে
যাত্রা শান: য'য়, মক্কাভীর্থ দর্শন বা হজব্রত পালন করিয়া
একজন উচ্চশ্রেণীর মুসলমান হইতে পারে? বস্তুতঃ যাত্রা
কোরান বিরুদ্ধ তাহা ইসলাম নয়, যাত্রা বেদ-বিরুদ্ধ হ'ত
হিন্দুধর্ম নয়। যে বেদ-কোরান উভয় পাঠ করিয়াছে, সে অত্যা
বলিবে, যে কোরান যেন ঋগ্বেদেবৃষ্ট দশ-কালোচিত পঞ্চম
সংস্করণ। ধর্ম লইয়া হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ নিতান্তই
বাতুলের কার্য। --- "রজ্জুতে সর্পভ্রম" ভিন্ন আর কিছুই নয়

কোরান বস্তুতঃই পঞ্চম বেদ। ঋগ্বেদের দ্রষ্টা ঋষি বসিষ্ঠের
প্রাণের অশুঃস্কুল ভেদ করিয়া প্রার্থনা উথিত হইয়াছিল
"ঋতশ্চ মিত্রাবরুণা পথা বামাপান নাবা তুরিতা তরম" ৭-৬৫-৫.
"হে দিবারাত্রিরূপে প্রকাশমান ঈশ্বর-মতিমা (মিত্রাবরুণা)
তোমাদের নিদ্দিষ্ট সত্যের পথে এবং ঋগ্বেদের পথে চলিয়া,
নৌকাদ্বারা যেমন জল পার হয়, আমরাও সেইরূপে পাপ সকল
অতিক্রম করিব," কোরানের দ্রষ্টা রসুলের ও প্রাণের অশুঃস্কুল
ভেদ করিয়া ঈশ্বরবাকী উথিত হইয়াছিল : "আকীমে সুসালাতা

ইলা স্মালাত তানহা আনল্ ফাত্ শায়ে ও-আল্ মুনক্ আর" ।
 (আনকাবুত (২৯)-৪৫) "উপাসনাকে রক্ষা কর, নিশ্চয়
 উপাসনা অশ্লীলতা এবং অন্যায় কার্য হইতে রক্ষা করিবে" ।
 উপনিষাদ ঋষির হৃদয়ের অমৃতসুন্দর ভেদ করিয়া প্রার্থনা বাঞ্ছিত
 হইয়াছিল, "অসতে মা সন্দাময় তমসে" মা জ্যোতির্গময়" ।
 পরমেশ্বর, "আমাকে অসতা হইতে সত্যতে লইয়া যাও
 অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও" । কারণের রসুলের ও
 হৃদয় হইতে শ্রীময় বাক্য ধ্বনিত হইয়াছিল "আল্লাহ ও-আলিয়ু
 ল্লাজীনা আমানু উয়ুখ্ রজুহুম্ স্মিনা ওলুমাত্তে এল' মুরে"
 বকরাত (২১)-৫৭ , "পরমেশ্বর তাহাদের রক্ষক যাহারা তাহাতে
 বিশ্বাস করে । তিনি তাহাদেরকে অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে
 লইয়া যান" । হৃদয় কায় শুরাশোপত হৃদয়ের অমৃতসুন্দর ভেদ
 করিয়া প্রার্থনা উক্তি হইয়াছিল, "ও সর্বব্যাপী পরমেশ্বর
 (বরুণ), "বাসস দূরে নিষ্কৃতিং পত্যাচঃ কৃতং চিদনঃ প্রমুমুগ্ধাস্যং"
 (১-১৪-২) "দূরে থাকিতেই মিথ্যার দেবতাকে (নিষ্কৃতি)
 বাধাদিয়া আমাদিগকে হইতে পলায়িত কর ; আমরা যে সকল
 পাপ করিয়াছি, তাহা হইতে আমাদিগকে প্রমুক্ত কর" । কারণ-
 ণের দ্রষ্টা রসুলের হৃদয় দর্পনও প্রকাশ "ও-আ কুল্ জা-আল্
 হাক্ ও-আ জাহাকাল্ বাতলেঃ । ইল্লাল্ বাতলেঃ কানঃ
 জাহকান" (বনি উস্রাইল (১৭)-৮১) "এক বল, সত্য
 আসিয়াছে, মিথ্যা দূর হইয়াছে, নিশ্চয় মিথ্যার ক্ষণস্থায়ী মাত্র
 উহা পরমালাচনা করিয়া, কে না বলিবে, যে সত্যই বাদেরও

প্রাণ, কোরাণেরও * প্রাণ, এবং উর্দু ভাষায়ও দেশকালগত
 ক্ষণিক ভেদ (“মুতাশাবেহাতুন”) সত্যের স্বরূপতঃ (মুতাশাবেহাতুন)
 সত্য এক এবং নিত্য। কে না বলিবে, যে অকিঞ্চিৎকর দেশ-
 কালগত ক্ষণিক ভেদ সত্যের বেদ, ইঞ্জিল, এবং কোরাণ স্বরূপতঃ
 এক, হিন্দুধর্ম, খৃষ্টধর্ম, এবং ইসলাম ধর্ম স্বরূপতঃ এক। হিন্দু-
 মুসলমান-খৃষ্টানকে অকিঞ্চিৎকর দেশকালগত ক্ষণিক ভেদ
 পরিত্যাগ করিয়, বেদ, ইঞ্জিল, এবং কোরাণের সারতত্ত্ব গ্রহণ
 করিতে হইবে। ইঞ্জিলের সারতত্ত্ব দুইটি খৃষ্ট সময় নিজমুখে
 ব্যক্ত করিয়াছিলেন :- (১) প্রভু পরমেশ্বরকে সর্দারকরণে
 ভালবাস, (২) প্রতিবেশীকে আপনার মত ভালবাস। যে বেদ
 কোরাণ পাঠ করিয়াছে, সেট বলিলে, যে তাহাই বেদ ও কোরা-
 ণেরও সারতত্ত্ব। হিন্দু মুসলমান ভুলিলে না যে ঈসা তাহাদের
 উভয়েই বিশেষ আদরের পাত্র। হিন্দু, রামমোহনের “The
 Precepts of Jesus, the guide to peace and happi-
 ness” দেখিবেন, এবং মুসলমান এট কোরাণ বচন দেখিবেন :-
 “এবং মরিয়ামের পুত্র ঈসাকে পরিষ্কার জ্ঞান দিয়াছিলাম, এবং
 তাহাকে পবিত্র অনুপ্রাণনাদ্বারা শক্তিশালী করিয়াছিলাম”—
 “ও-আ আয়্যাদনাহু বে কুতল্ কুতুসে” (বকরাহ (২)-৮৭।
 এস্থলে উহাও বলিতে হয় যে বেদের উপরে যেমন পরমর্তী কালে
 স্মৃতিপুরাণাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কোরাণের উপরে ও মহম্মদের

* ইঞ্জিলের প্রভু প্রার্থনার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কে না বলিবে যে
 তাহাই ইঞ্জিলের ও প্রাণ ?

পরবর্তীদেরদ্বারা হাদিসাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এবং স্মৃতি পুরাণাদি সম্বন্ধে যেমন জৈমিনীয় মীমাংসা বাক্য সত্য, যে “বিরোধে ত্বনাপক্ষাং স্মাদসতি অনুমানঃ,” “বেদের সহিত বিরোধ থাকিলে, স্মৃতিপুরাণের বচন আদরের অযোগ্য, আর যদি বিরুদ্ধ না হয়, তবে তদৃষ্টে যথাযোগ্য অনুমান করা যাইতে পারে,” হাদিসাদি সম্বন্ধেও এ কথা সত্য, যে তাহা কোরাণ বচনের বিরুদ্ধ হইলে, আদরের অযোগ্য, আর যদি বিরুদ্ধ না হয়, তবে তদৃষ্টে যথাযোগ্য অনুমান করা যাইতে পারে।

বেদ, কোরাণ, এবং ঈঞ্জিলসিদ্ধ সেই সার্বভৌমিক সত্য ধর্মের মূলতত্ত্ব, ঈশ্বরপ্রীতি এবং মানবপ্রীতি, হইতে বিচ্যুত হইয়া, ধর্মসকল পরস্পরের প্রতি হিংসাবিদ্বেষে পরিণত হইয়াছে। হায়, হিন্দুধর্ম কি এই বঙ্গদেশে আজকালের দিনে মুসলমান-বিদ্বেষে, এবং ইসলাম ধর্ম কি হিন্দু-বিদ্বেষে পরিণত হইতেছে না? তাই আমরা উভয়কে তাহাদের সেই সার্বভৌমিকধর্মমূলের দিকে আহ্বান করিতেছি। প্রকৃত ইসলাম ধর্ম কি? (১) একেশ্বরে বিশ্বাস, “ইলাহুকুম ইলাহু ও-আহেদুন্ (২-১৬৩), এবং উপাসনা কর,—“ইয়ুকিমুনাস্ সালাতা” (২-৩)। (২) সৎ-কর্ম কর —“আমেলুস্ সালাহাতে” (২-২৫)। (৩) জানিয়া শুনিয়া মকদ্দমাজীবীদের মত সত্যকে গোপন করিও না, বা মিথ্যার সহিত মিশাইও না, “লা তালবেশুল্ হাক্বা বেলে বাতিলে ও-আ তাক্তুমুল্ হাক্বা ও-আ আন্তুম তালামুনা (২-৪২)। (৪) দরিজের হিতের জন্য অর্থ দান কর, “আতুজ্ জাকাতা” (২-৪৩)।

(৫) শুদ্ধখুরী করিও না, “হার্গামা রে বা” (২-১৭৫)‡। (৬) ঈশ্বর-
 বিশ্বাসীরা পরস্পরকে ভাই বলিয়া জানিবে, “ইল্লামাল্ মুমিনুন!
 এখও-আতুন” (৪৯-১০)। (৭) ধর্মবিষয়ে বলপ্রয়োগ করিবে না,
 “লা একরাহা ফীদ্বীনে” (২-২৫৬)। (৮) সমস্ত মানব-মণ্ডলীকে
 একই ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত জানিবে, “কানা নামো উম্মাতান্ ও-আ-
 হেদাতান্” (২-১১৩)। ইহাট প্রকৃত ইসলাম, ইহাট প্রকৃত হিন্দু
 ধর্ম, ইহাট প্রকৃত খৃষ্টধর্ম *। এ ধর্মের নিশ্চয় জয় হইবে।
 ইসলাম নাম দিয়া, বা হিন্দুধর্ম নাম দিয়া, বা খৃষ্টধর্ম নাম দিয়া,
 প্রচার করিলেও, ইহা ভিন্ন অন্য কোন উপধর্মের জয় হইবে না।
 হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান মিলিয়া, কেন তবে আমবা সকলে গগন-
 মেদিনী কাঁপাইয়া সমস্বরে বলিব না, “আল্লাহু আক্বাবু,” “ব্রহ্ম-
 কৃপা হি কেবলং,” “Glory to God in the highest and
 on earth peace, good will toward men”। “যতো
 ধর্মস্ততো জয়ঃ”। †

হে সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর, হে আল্লাহ্, যমজ সন্তানের
 মত তুমি এই হিন্দু-মুসলমানকে তেরশত বৎসর যাবৎ একত্রে

‡ নানুগ্ ব্রাহ্মণো ভবতি, ন বণিক্ ন কুসীদজীবি, বসিষ্ঠ সংহিতা—৩।

* ও-আ আতাইনা ঈমা ব্না মার্বামাল্ বায়ানাতো ও-আ আয়াদ্-
 নাহু বে কহেল্ কুদুমে। ২-৮৭। এবং মরিয়ামের পুত্র ঈসাকে বিশুদ্ধ যুক্তি
 দিয়াছি, এবং পবিত্র আত্মাধারা বলশালী করিয়াছি।

† আজ প্রায় ৩০ বৎসর হইল, আমি যখন বরিশালে ডেপুটি মেজেষ্ট্র
 ছিলাম, মৌলবী হোসনালী নামে হোসান্কাবাদের একজন মুসলমান ধর্ম-
 প্রচারক নিজে আমাকে বলিয়াছিলেন, যে যখন ব্রাহ্ম প্রচারক স্বর্গীয় গৌর-
 গোবিন্দ রায় হোসান্কাবাদের প্রচারে গিয়াছিলেন, তখন একজন মুসলমান যুবক

বাখিয়াছ, কিন্তু জা'ত ও তাতারা মিলিয়া, মিশিয়া, একস্বার্থে বন্ধ হইয়া একজাতি হইতেছে না, পরস্পর খুনাখুনি করিয়া মরিতেছে। দেশের জনসাধারণ ঘোর অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন থাকিয়া অনাতারের মহামারীতে অকালে মরিতেছে! কেহ কাটারো দুঃখে দুঃখী না হইয়া, দারিদ্রের রক্ত শোষণ করিয়া, পশুর মত স্থগিত জীবন যাপন করিতেছে। হে প্রভো, তুমি ভিন্ন এ দুঃখীদিগকে উদ্ধার কর, এমন কে আছে? তাই তোমারই নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি হিন্দুমুসলমানকে এই স্তুতি দেও, যেন আমরা তোমার নামে, তোমার প্রেমে এক হইয়া, পরস্পরকে প্রাণের ভাই বণিয়া গ্রহণ করিয়া, এক জাতি হইয়া, এক স্বার্থে বন্ধ হইয়া, দেশের দুঃখ দূর করিতে পারি।

• কুমিল্লা ২৬, সেপ্টেম্বর,
১৯২৭ ইং।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে। তাহাতে মুসলমান মহলে অত্যন্ত গোলমাল উপস্থিত হয়। তখন এক বিরাট সভা আহত হয়। তাহাতে এই বিচার হইল, যে ইসলামই ঠিক, কি ব্রাহ্ম ধর্ম ঠিক। ইসলামের পক্ষে মৌলানী হোসেন আলী নিযুক্ত হইলেন, এবং ব্রাহ্ম ধর্মের পক্ষে দাঁড়াইলেন গৌরগোবিন্দ রায়। সভা বসিলে পর, হোসেন আলী প্রশ্ন করিলেন “আল্লাহ্ কয়টো”? গৌর বাবু উত্তর করিলেন “আল্লাহ্ এক”। হোসেন আলী প্রশ্ন করিলেন “মহম্মদকো আপকোয়া সমজ্তে”? গৌর বাবু উত্তর করিলেন, “মহম্মদ খোদাসে ভেজা হু-আ দুনিয়াকা ভালাইকা ও-আস্তে”। উত্তর শুনিবামাত্র হোসেন আলী হাসিয়া বলিলেন :—“ইস্মে হাম কোয়া লড়ে! ই-এ তো মুসল্গিন হোয়”। তাঁহার কথা শুনিয়া সভাশুদ্ধ ম'কলে হাসিতে হাসিতে সভা ভঙ্গ করিয়া চলিয়া গেলেন।

Extract from Raja Rammohan Ray's Trust-deed.

“Upon trust and in confidence that they (the said trustees) or the survivor of them, or their heirs, &c, shall from time to time, for ever hereafter, permit the said messuage or building, land, tenements, &c, with their appurtenances, to be used, &c, as a place of public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction, as shall behave and conduct themselves in an orderly, sober, religious, and devout manner, for the worship and adoration of the eternal, unsearchable and immutable being, who is the Author and Preserver of the universe”. (The Raja's trust-deed adds) “and that no sermon, preaching, discourse, prayer, or hymn, be delivered or used in such worship, but such as have a tendency to the promotion of the contemplation of the Author and Preserver of the universe, to the promotion of charity, morality, piety, benevolence, virtue, and the strengthening the bonds of union between men of all religious persuasions and creeds.”

সূচীপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
(নাজে বা-জ) কোরাণের হুবা ও নাজ	১-৩
শুরা কাতেহা, নাম, ফালাক্, ইখ্লাম, লাভাব	৩—১০
সুর নসর, কাফেরুন, কাউম, মা-উন, কোবেইশ, ফীল্, কদস	১০—১৯
ইন্শাম ধর্মের বোকন বা স্তম্ভ-কক, (ক) কঃন	২০—২২
(খ) সালাৎ, নাজ, বা উপাসনা	২২-৩০
(গ) হোজা বা উপবাস	৩১-৪০
(ঘ) জকাত বা দীন-উঃখীৰ জন্তু দান	৪১-৫৪
(ঙ) হজ্ বা মক্কা-তীর্থ দর্শন	৫৫-৬৩
আলাহ্	৬৪-৮৭
কোরাণে সালাৎ বা উপাসনা	৮৮-৯৮
কোরাণে আবশুক জীবিকা	৯৯-১১৪
মুন্নেন্ নমাজে প্রচলিত নাজ বা উপাসনা	১১৫-১১৭
পাচবেগা নমাজ	১১৭
নাজের অঙ্গভেদ	১১৭-১১৯
আজান ও একামৎ	১১৯-১২১
নমাজ, ফরজ ও সুন্নত	১২১-১২২
ফরজ নামাজের বর্ণনা	১২২-১৩০
সর্ব-দর্শ-সম্বয়	১৩১-১৩৬
উপসংহার	১৩৭-১৪০
কোরাণের সংক্ষিপ্ত বিষয়-সূচী	পরিশিষ্ট

(নমাজে ব্যবহৃত)

কোরানের সূরা

ও

নমাজ.

(রহমতুল্লাহ সহ বাংলা অনুবাদ)



কোরান কি ? কোরাণই উত্তর দিতেছে :—ইন্ ত-বা ইল্লা
জিক্কন্ লিল্ আলামীন । লে মান্ শা-আ মিন্ কুম্ আন্
ইয়্যাস্তাকীম ॥ আৎ তক্বীর, ৮১-২৭, ২৮ ॥ “ইহা মানবজাতি-সকলের
(আলামীন) চৈতন্যদায়ক (জেক্করণ) ভিন্ন অন্য কিছু নয় । ইহা
তোমাদের মধ্যে (মিন্ কুম্) তাহারই জন্ম, যে সরল সত্যের পথে
চলিতে (ইয়্যাস্তাকীম) বাসনা করে (শা-আ)” । কোরাণ কি ?
কোরান আবার উত্তর দিতেছে :—ইয়া আ-ইয়্যাহন্নাসো কাদ্ জা-
আৎকুম্ শ্বাও-এজ্জাতুন্ শ্বিন্ রবেকুম্ ও-আ শেফাউন্ লে মা ফিস্-
হুহুরে ॥ ইয়্যুস্, ১০-৫৭ ॥ “হে মানবমণ্ডলী, নিশ্চয় তোমাদের
প্রভুর নিকট হইতে তোমাদের জন্ম উপদেশ আসিয়াছে, এবং
তোমাদের হৃদয়ে যে ব্যাধি আছে, তাহার ঔষধ আসিয়াছে,
এবং বিশ্বাসীদের জন্ম পথ প্রদর্শন এবং দয়া আসিয়াছে ।”

হিন্দু-মুসলমান সকলে দেখিবেন, এই কোরাণ সমস্ত মানবজাতির
জন্য। যাহারা কোরাণ পাঠিয়াছেন, তাহাদের অবশ্য-কর্তব্য,
যে হিন্দু-খ্রীষ্টানাди সকল জাতির নিকটে এই কোরাণ প্রচার হয়।

আবার কোরাণের সফল পাঠিতে হইলে সকলকেই
কোরাণ বুঝিতে হইবে। কোরাণ বলিতেছে :—ও-আ
লাউ জাআল্‌নাহো কুরআনান্ আ'জামীয়ান্ ল্লাকালু লাউ লা
ফুসসীয়া আয়াতুহা। আ আ'জামিয়ুন্ ও-আ আরাবিয়ুন্ ॥”
(হামিম্, ৪১-৪৪ ১,৩), “এবং আমরা যদি বিদেশীয় ভাষায়
কোরাণ করিতাম : তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা বলিত,—
কেন ইহার উপদেশ-সকল সহজ করিয়া বুঝান হয় না? কি!
বিদেশীয় ভাষা, আর আরবী লোক”। আবার বলিতেছে :—
ইন্না জা-আল্‌নাহু কুরআনান্ আরা-বিয়ান্ লাআল্লাকুম্
তা'কিলুন ॥ আউ-জুখরুফ্ ৪৩-৩ ॥, “নিশ্চয় আমরা ইহাকে আরবী
কোরাণ করিয়াছি, যেন তোমরা বুঝিতে পার”। মুসলমান হউক
বা হিন্দু হউক, বঙ্গবাসীকেও যদি কোরাণের সফল পাঠিতে হয়,
কোরাণ বুঝিতে হইবে। শুধু তোতার মত মুখস্থ করিয়া, হিন্দু
অথবা মুসলমান, বেদের অথবা কোরাণের সফল পাঠিতে
পারিবে না। হিন্দুই হউক, আর মুসলমানই হউক, বঙ্গবাসী
যখন আরবী বুঝে না, আরবী অক্ষর পর্যাস্ত চিনে না, তখন
বাংলা অক্ষরে বঙ্গানুবাদসহ সকলকে কোরাণ দিতে হইবে, যেন
সকলে পড়িতে পারে, বুঝিতে পারে (তা'কিলুন)। না বুঝিতে
পারিলে, (বেদ কি) কোরাণ পাওয়ার কোন অর্থ নাই। এমন কি

কোরানের অর্থ কি নমাজের অর্থ বুঝিতে না পারে, একপ অনস্থায় নমাজে যাঠিতে ও কোরান নিষেধ করিতেছে। কোরান বলিতেছে, ঈয়া-আইয়ুহাল্লাজীনা আমানু লা তাক্‌রাবুস্‌ সালাতা ও-আ আন্তুম্‌ সুকারা হাত্তা তা'লামু মা তাকুলুনা, সুরা আন-নিসা (৪)-৭৩—“হে বিশ্বাসীগণ যখন তোমরা মাতাল থাক, নমাজের নিকটে যাঠিও না, যতক্ষণ তোমরা যাহা বল, তাহা বুঝিতে না পার”।

(১) সূরা ফাতেহা (আরম্ভ) ।

[The reader should bear in mind that in Vedic Sanskrit স = s, and শ = sh in English ; and we shall use these letters in our Arabic transliteration, “স” for “seen” and “শ” for “sheen”].

বিস্মেল্লাহের রহমানের রহিম ।

দাতা (আব্দ-রহমান) দয়াময় (আব্দ-রহিম) পরমেশ্বরের (আল্লাহো) নাম লইয়া (ঈশ্ব = নাম) আরম্ভ করা যাঠিতেছে ।

∴ দাতা দয়াময় পরমেশ্বরের নাম লইয়া, আরম্ভ করা যাঠিতেছে ।

১ । আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহে রাব্বিল্‌ আ-লামিন ।

সমস্ত (আল্) প্রশংসা (হাম্‌দ) বিশ্বের (আলামিন) প্রতিপালক (রব্ব) পরমেশ্বরের জন্ত (লিল্লাহে),

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বের প্রতিপালক পরমেশ্বরের জন্য ।

২। আর রাহ্‌মানের রাহিম।

যিনি দাতা এবং দয়ালু।

৩। মালেক ইয়্যাওমেদ্দিন।

যিনি দণ্ড পুরস্কারের (দিন) কালের (ইয়াউম) প্রভু (মালেক)।

যিনি বিচারের কালের প্রভু।

৪। ঈয়্যাকা না' বুদু ও-আ ঈয়্যাকা নাস্তাইন।

তোমাকেই (ঈয়্যাকা) আমরা আরাধনা করিতেছি (না'বুদু), এবং তোমারই নিকটে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি (নাস্তাইন)।

তোমাকেই আমরা আরাধনা করিতেছি, এবং তোমারই নিকটে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

৫। এহ্‌দে নাস্‌ সেরাতাল্‌ মুস্তাকিমা।

আমাদিগকে সরল সত্য (মুস্তাকিম) পথে (সেরাতাল্) চালাও (এহ্‌দিনা)।

আমাদিগকে সরল সত্যপথে চালাও।

৬। সেরাতাল্‌লাজিনা আন্‌ আম্‌তা আলাইহিম্‌।

তাহাদিগের (আল্লাজিনা) পথে (সেবাত্) তাহাদিগের উপরে (আলাইহিম্) তুমি অনুগ্রহ করিয়াছ (আন্‌আম্‌তা) ;

তাহাদিগের উপরে তুমি অনুগ্রহ করিয়াছ, তাহাদিগের পথে চালাও :

৭। গাইরিল্‌ মাগ্‌ দুবে আলাইহিম্‌ ওয়া লা দ্দাওয়ীনা।

তাহাদের পথে নয় (গাইরিল্) তাহাদের উপরে (আলাইহিম্) তোমার ক্রোধ পতিত (মাগ্‌দুবে), বা (ও-আ) তাহারা পথভ্রষ্ট (দাওয়ীনা)।

যাহাদের উপরে তোমার ক্রোধ পতিত বা যাহারা পথভ্রষ্ট,
তাহাদের পথে নয় ।

(২) সূরা আন্-নাস [মানুষ] ।

বিস্মিল্লাহের রহমানের রহিম ।

দাতা দয়াময় পরমেশ্বরের নাম লইয়া আরম্ভ করিতেছি ।

১ । কুল্ আউজো বেরাবিল্লাসে,

বল (কুল্) আমি আশ্রয় লইতেছি (আউজো) মানুষের (নামে)
প্রতিপালকের (রব্) নিকটে (বে),

বল, আমি মানুষের প্রতিপালকের আশ্রয় লইতেছি,

২ । মালিকিল্লাসে,

মানুষের প্রভুর (মালেক) নিকটে,

মানুষের প্রভুর আশ্রয় লইতেছি,

৩ । এলাহিল্লাসে,

মানুষের উপাস্ত (এলাহে) পরমেশ্বরের নিকটে,

মানুষের উপাস্ত পরমেশ্বরের আশ্রয় লইতেছি,

৪ । মিন্শাররিল ওয়াসওয়াসিল্ খাল্লাসে,

শুণ্ড কুমজনা দাতার (খাল্লাস) শুণ্ড কুমজনার (ওয়াসওয়াসিল্)
অনিষ্টকারিতা (শার্) হইতে (মিন্),

শুণ্ড কুমজনাদাতার শুণ্ড কুমজনার অনিষ্টকারিতা হইতে,

৫। ল্লাজি ইউ-ইয়াস্ বিস্মো ফি স্তুরি নামে,

যে কুমন্ত্রনা দাতা মানুষের (নাম্) অন্তরে (ফী স্তুর) কুমন্ত্রনা দেয়
(ইউ-ইয়াস্ বসো),

যে কুমন্ত্রনাদাতা মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রনা দেয়,

৬। মিনাল্ জিন্নাতে ইয়ান্নাসে ।

জিন্দেব ও মানুষদের কৃত অনিষ্ট হঠাতে পরমেশ্বরের
আশ্রয় লইতেছি ।

‘জিন্ নাম যেমন একদিকে অদৃশ্য-দেহবাহী এক শ্রেণীর জীবের প্রতি
প্রযুক্ত হইত, অপবদিকে দাতার আবলদেশবাসী নয়, অথবা ভিন্নদেশবাসী,
তাহাদের প্রতিও প্রযুক্ত হইত । মৌলবী মোহাম্মদ আলী প্রকাশিত
কোবাণে সূরা আল জিন্ দেখ ।

(৩) সূরা ফালাকে—প্রাতঃকাল ।

বিস্মিল্লাহের রহমানেররহিম ।

দাতা দয়াময় পরমেশ্বরের নাম লইয়া আরম্ভ করিতেছি ।

১। কুল্ আউজো বে রাব্বল্ ফালাকে

তুমি বল [কুল্], আমি আশ্রয় লইতেছি [আ-উজো] প্রভাতের
[ফালাক] প্রভুর নিকটে । বেরামে]

* Note that ব in Bengali stands for both
b and v in English, and be and waw in Arabic.

তুমি বল, আমি প্ৰভাতের প্ৰভুর আশ্রয় লইতেছি,

১। মিন্ শার্বরে মা খালাকা

তিনি যাহা (মা) সৃষ্টি করিয়াছেন (খালাক্) তাহার অনিষ্টকারিতা
(শার্ব) হইতে (মিন্)

তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার কৃত অনিষ্ট হইতে.

৩। ও-আ মিন্ শার্বরে গাসেকিন্ এজা ও-আকানা

এং গাচ অঙ্ককারময় বারিত (গাসেক) অনিষ্টকারিতা (শার্ব)
হইতে (মিন্) যখন (এজা) তাহা আসে (কানা)

এং গাচ অঙ্ককারময় বারিত অনিষ্টকারিতা হইতে, যখন
তাহা আসে.

৪। ও-আ মিন শার্বরে ন্নাফ্ ফাসাতে ফ'ল্ টকাদে

এং তাহাদের অনিষ্টকারিতা হইতে (মিন্ শার্বরে) যাহা দৃঢ়
সঙ্কল্পের মধ্যে (টকাদ) গাচ (ফ'ল্) ক'চিৎ নিষ্কপ করে (ন্নাফ্ ফাসাতে)

এং তাহাদের অনিষ্টকারিতা হইতে, যাহারা দৃঢ়
সঙ্কল্পের মধ্যে ও কুচিন্তা নিষ্কপ করে.

৫। ও-আ মিন্ শার্বরে হাসেদিন্ এজা হাসাদা

এং হিংসুকদিগের (হাসেদিন্) কৃত অনিষ্টকারিতা হইতে
(মিন্ শার্বরে) যখন (এজা) সে হিংসা করে (হাসাদা)

এং হিংসুকদিগের কৃত অনিষ্ট হইতে যখন সে হিংসা
করে ।

[৪] সূরা ইখলাস - একত্ব ।

বিস্মিল্লাহের রহমানের রাহিম ।

দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বরের নাম লইয়া আরম্ভ করা যাঠিতেছে ।

১। কুল্ হোআ ল্লাহো আহাদুন্

তুমি বল (কুল্) তিনি (হু-আ) পরমেশ্বর, এক (আহাদ)

বল, তিনি পরমেশ্বর, এক,

২। আল্লাহাস্ সামাদো

পরমেশ্বর, তিনি (হু-আ), যিনি কাহাকেও আশ্রয় করেন না, যাহাকে সকলে আশ্রয় কবে (সামাদ) ।

পরমেশ্বর তিনি, যিনি কাহাকেও আশ্রয় করেন না, যাহাকে সকলে আশ্রয় করে ।

৩। লাম্ ইয়ালিদ্

তিনি কাহাকেও জন্ম * দেয় (ইয়ালিদ্) নাই (লাম্)

তিনি কাহাকেও জন্ম দেয় নাই,

৪। ও-আ লাম্ ইউলাদ্

এবং কেহ তাহাকে জন্ম দেয় (ইউলাদ্) নাই (লাম) ।

এবং কেহ তাহাকে জন্ম দেয় নাই ।

* মানুষ যেমন সন্তানের জন্ম দেয়, এবং অনেক ঐশ্বরবাদী হয়ত বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর মেরুপে খৃষ্টের জন্ম দিয়াছিলেন, এস্থলে কোরাণে মেরুপ জন্ম দেওয়ারকেই লক্ষ্য করা হইতেছে । বেদান্তের সৃষ্টির অর্থে "জন্মান্তর যতঃ" — জন্ম শব্দের ব্যবহারকে লক্ষ্য করা হয় নাই ।

৪। ও-আ লাম্ ইয়াকুন্ ল্লাহ্ কুফোবান্ আহাদুন্ ।

৫.৬০ . ও-আ) হয় নাই (ইয়াকুন্ লাম্) কেহ (আহাদ)
প্রাণ পক্ষে (লাহ্) সমান (কুফু)

এব তাহার সমান কেহ নাই ।

[৫] সূরা আল্-লাহাব—অগ্নিশিখা ।

বিস্মেল্লাহের রহমানের রাহিমে ।

দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বরের নাম লইয়া আরম্ভ করা
যাউতেছে ।

১। তাক্বাৎ ইয়াদা আবী লাহাবিন্ ও-আ তাক্বা ।

আবুলাহাবের (আবী লাহাবিন্) হাত দুটি (ইয়াদা) বিনষ্ট হউক
(তাক্বাৎ) , এবং সেও বিনষ্ট হইবে (তাক্বা) ।

আবুলাহাবের হাত দুটি বিনষ্ট হউক, এবং সেও বিনষ্ট হইবে

২। মা আগ্না আন্থো মালুহা ও-আ মা কাসাবা

প্রাণ পন (মালু হো) এবং যাহা কিছু সে উপার্জন করিয়াছিল (মা
কাসাবা) , তাহা তাহার (আন্থো) উপকারে আসে নাই (মা আগ্নায়া) ।

তাহার পন এবং যাহা কিছু সে উপার্জন করিয়াছিল, তাহা
তাহার উপকারে আসিবে না ।

৩। সাইয়াস্লা নারান্ জাতা লাহাবিন্

শীঘ্রই (সা) সে শিখায়ুক্ত (সাহাব) অগ্নিতে । নাবন্ জাহা)
দগ্ন হইবে (ইয়াস্লা),

শীঘ্রই সে শিখায়ুক্ত অগ্নিতে দগ্ন হইবে.

৬। ও-আমরা আ-তুহা, হাম্মা লাতন্ হাতাবি

তাহার স্ত্রী (ইম্বাআতুহে) ও দগ্ন হইবে, যে পরনিদারূপ জ্ঞান
কাঠের (হাতাব্) বহনকারী (হাম্মালাত)

তাহার স্ত্রীও দগ্ন হইবে, যে পরনিদারূপ জ্ঞান কাঠের
বহনকারী

৭। ফী জীদেহা হাবলুন্ শ্বিন্ মাসাদিন্

তাহার স্ত্রীর (ইম্বাআতুহে) গলায় (জীদেহে) খেজুর গাছের আঁশের
(মাসাদ্) দড়ি (হাবাল্)।

তাহার স্ত্রীর গলায় খেজুর গাছের আঁশের দড়ি ।

আবুলাহাব, তাহার আসল নাম আবতুল উজ্জা, হজরতের চাচা হিন
হজরতের ঘোর বিরোধী ছিলেন, এবং হজরতকে পাগল বলিতেন। আবু
লাহাবের স্ত্রী হজরতের চলবার পথে কাটা ছুঁয়াইয়া রাখিতেন :

(৬) সূরা আন্-নসূর—সাহায্য ।

বিস্-মেলাহের্ রহমানের্ রহিমে ।

দাতা দয়াময় পরমেশ্বরের নাম লইয়া আৰুস্ত করা যাইতেছে

১। এজা জা-আ নসূরো ল্লাহে ওআল্ কাৎহা,

যখন (এজা) আল্লাহ সাহায্য (নসূর) আমে (জা-আ), এবং 'মকা'

জয় (ফংহো) হয়,

যখন আল্লার সাহায্য আসে, এবং মক্কা জয় হয়,

২। ও-আ রা-আয়তাহ্‌ নাসা ইয়াদ্‌ খুলুনা কী নীনে হাঃ
আফ্‌-ও-আজান্‌

এবং তুমি দেখ (বা-আয়তাহ্‌) লোক সকল (নাস্‌) দলে দলে অফ্‌-ও-আজান্‌ । পরেশর মনো (কী নীনে) প্রবেশ করিতেছে (ইয়াদ্‌ খুলুনা

এবং তুমি দেখ লোক সকল দলে দলে পরেশর মনো প্রবেশ করিতেছে,

৩। ফা সাক্বাহ্‌ বে হাম্‌দে রাব্বিকা ও-আস্‌তাগ্‌ফরুহা
ইম্মাহো কানা তাও-আবান্‌

তখন (ফা) তোমার প্রভুর (রব্বিকা) মহিমা (হাম্‌দে) কীর্তন কর (সাক্বাহ্‌), এবং তাহার নিকট (হো) ক্ষমা প্রার্থনা কর (ও-আস্‌তাগ্‌ফরুহা) । নিশ্চয় (ইম্মাহো) তিনি (হো) সর্বদা দোষ-মার্জ্জনাকারী (তাও-আবান্‌) হইয়া আছেন (কানা)

তখন তোমার প্রভুর মহিমা কীর্তন কর, এবং তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর । নিশ্চয় তিনি সর্বদা দোষ মার্জ্জনা করেন ।

(৭) সূরা কাফেরুণ—অবিশ্বাসীগণ ।

বিস্মেল্লাহির রহমানের রহিম ।

দাতা দয়াময় পরমেশ্বরের নাম লইয়া আরম্ভ করা যাউতেছে ।

১। কুল্‌ ইয়া আইয়ুহাল্‌ কাফেরুণা।

বল (কল), হে (ইয়া আইযুহাল্) অবিশ্বাসীগণ (কাফেরনা),

বল, তু অবিশ্বাসীগণ,

১। লা আ' বোদো মা তা' বোদনা

আমি পূজা করিনা। আ'বোদো লা) যাহাকে (না) তোমরা পূজা কর 'তা' বোদনা),

আমি পূজা করিনা, যাহাকে তোমরা পূজা কর,

৩। ও-আ লা আন্তুম্ আবেদনা মা আ' বোদো

এবং ও-আ) তোমরা ও। আন্তুম্) পূজা করিবেনা। (আবেদনা লা) যাহাকে (না) আমি পূজা করি (আ' বোদো),

এবং তোমরা ও পূজা করিবেনা যাহাকে আমি পূজা করি,

৪। ও-আ লা আনা আবেদুন্মা আবাদন্তুম্

এবং (ও-আ) আমি (আনা) পূজা করিব না (আবেদনা লা) যাহাকে (না) তোমরা পূজা করিতেছ (আবাদন্তুম্)।

এবং আমিও পূজা করি না যাহাকে তোমরা পূজা করিতেছ,

৫। ও-আ লা আন্তুম্ আবেদনা মা আ' বোদো

এবং (ও-আ) তোমরা (আন্তুম্) তাঁহা পূজক নও (আবেদনা লা) যাহাকে (না) আমি পূজা করি (আ' বোদো)।

এবং তোমরা তাঁহা পূজক নও যাহাকে আমি পূজা করি।

৬। লা কুম্ দীনো কুম্ ও-আ লেয়া দীনে।

তোমাদের জন্ত (লা কুম্) তোমাদের (কুম্) পুরস্কার (দীনো),
আমাদের জন্ত (লেয়া) আমার পুরস্কার (দিন)।

(৮) সূরা আল্-কাউসার (মঙ্গলের প্রচুরতা) ।

বিস্মেল্লাহের রহমানের রহিমে

১। ইন্না আ'তাইনাকাল্ কাউসারা,

নিশ্চয় (ইন্না) আমরা মঙ্গলের প্রচুরতা (কাউসার) তোমাকে দান
করিয়াছি (আ'তাইনা কা),

অবশ্য আমরা তোমাকে মঙ্গলের প্রচুরতা দান করিয়াছি,

২। ফা সাল্লে লে রবেকা ও-আন্-হার,

অতএব (ফ) তোমার প্রভুর নিকটে (লে রবেকা) প্রার্থনা কর
(সাল্লে), এবং তাঁহার উদ্দেশে বলি প্রদান কর (ইন্হার)।

অতএব তোমার প্রভুর নিকটে প্রার্থনা কর, এবং তাঁহার
• উদ্দেশে বলি প্রদান কর ।

৩। ইন্না শানি-আকা ছ্বাল্ আবতারু ।

নিশ্চয় (ইন্না) তোমার শত্রুর (শানি-আকা) মঙ্গলের সূত্র কাটিয়া
গিয়াছে (আবতারু)।

নিশ্চয় তোমার শত্রুর মঙ্গলের সূত্র কাটিয়া গিয়াছে ৷

স্বর্গের একটি ঝরণার ও নাম কাউসার । পশু শব্দে "আবতারু" অর্থ
'লেজকাটা' । মানুষ শব্দে অর্থ মঙ্গল হইতে ভ্রষ্ট ।

[৯] সূরা আল্-মা'উন [সাহায্য দান]

বিস্মিল্লাহের রহমানের রহিম

১। আরাআইতা ল্লাজি ইয়াকাজ্জিবু বেদীনে ?

তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ (আরাআইতা) যে (লাজী) ধর্মকে (বেদীনে) মিথ্যা মনে করে (ইয়াকাজ্জিবু) ?

তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ যে ধর্মকে মিথ্যা মনে করে ?

২। ফা জালেকা ল্লাজী ইয়াদ্-উল্ ইয়াতীমা,

তবে (ফা) সে ঐ ব্যক্তি (জালেকা) যে অনাথের প্রতি (ইয়াতীমা) কর্কশ ব্যবহার করে (ইয়াদ্-উ),

তবে সে, ঐ ব্যক্তি যে অনাথের প্রতি কর্কশ ব্যবহার করে,

৩। ও-আ, লা ইয়াছ্ছু আলা তা-আ-মেল্ মিস্কীনে ।

এবং দরিদ্রকে (মিস্কীন) অন্নদান (তা-আম) করিবার দিকে (আলা) উৎসাহ দেয় না (লা ইয়াছ্ছু) ॥

এবং দরিদ্রকে অন্নদান করিতে উৎসাহ দেয় না ।

৪। ফা ও-আইলুন্ লিল্ মুসাল্লীনা,

অতএব (ফা) সেরূপ ননাজকারী বা উপাসনাকারীর জন্য (মুসাল্লীন) দুঃখ (ও-আইল),

অতএব সেরূপ লোক-দেখান নমাজ-কারীর জন্য দুঃখ,

৫। ল্লাজীনা হুম্ আন্ সালাতেহিম্ সাছনা,

যাহারা (ল্লাজীনা) তাহাদের নমাজ সম্বন্ধে (সালাতেহিম্) উদাসীন (সাছনা),

যাহারা (অনাথ এবং দরিদ্রের সাহায্য করিয়া) তাহাদের
নমাজকে সার্থক করিবার বিষয়ে উদাসীন,

৬। লাজীনা হুম্ ইয়ুরাউনা,

যাহারা লোককে দেখাইবার জন্য (ইয়ুরাউনা) সংকার্য্য করে,

যাহারা কেবল লোককে দেখাইবার জন্য সংকার্য্য করে,

৭। ও-আ ইয়াম্‌নাঈনা ল্‌ মাউনা ।

এবং দরিদ্রকে সাহায্য দেওয়া হইতে (মাউনা) বিরত থাকে
(ইয়াম্‌নাউনা),

এবং যাহারা দরিদ্রকে সাহায্য দেওয়া হইতে বিরত থাকে ।

[১০] সূরা আল্-কোরৈশ্

(কাবার রক্ষক-বংশ)

বিস্‌মেলাহের্‌ রহমানের্‌ রহিম

১। লে ঈলাফে কুরাইশিন্

কোরাইশ্ বংশীয়দিগের রক্ষার (ঈলাফে) জন্য (লা)—

কোরাইশ্ বংশীয়দিগের রক্ষার জন্য—

২। ঈলাফে হিম্ রেহ্‌লাতাশ্ শেতায়ে ও-আস্‌সাইফে—

শীতে (শেতায়ে) ও গ্রীষ্মে (সাইফে) ভ্রমণের সময়ে (রেহ্‌লাত!)

তাহাদের রক্ষার জন্য (ঈলাফেহিম্)—

শীতে ও গ্রীষ্মে ভ্রমণের সময়ে তাহাদের রক্ষার জন্য—

৩। ফাল্ ইয়া'বুদো রাব্বা হাজাল্ বাইতে,

অতএব (ফা) তাহাদের উচিত যে তাহারা সেবা করে (ইয়া'বুদো) এই (হাজা) গৃহের (বাইৎ) প্রভুর (রব্বা),

অতএব তাহাদের উচিত যে তাহারা এই গৃহের প্রভুর সেবা করে,

৪। ল্লাজি আৎ-আমাহ্‌ম্‌ স্মিন্‌ জুইন্‌, ও-আ আমানাহ্‌ম্‌ স্মিন্‌ খাওফিন্‌ ।

যিনি তাহাদিগকে ক্ষুধার সময়ে (জু-ইন্‌) খাওয়াইয়াছেন (আৎ-আমাহ্‌ম্‌), এবং ভয়ের সময় (খাওফিন্‌) অভয় দিয়াছেন (আমানাহ্‌ম্‌) ॥

যিনি তাহাদিগের ক্ষুধার সময়ে খাওয়াইয়াছেন, এবং ভয়ের সময় অভয় দিয়াছেন ।

[১১] সূরা আল্-ফীল (হস্তী) ।

বিস্মিল্লাহের রহমানের রহিম

১। আলাম্‌ তারা কাইফা ফা-আ-লা রাব্বূকা বে আস্-হাবেল্‌ ফীলে ?

তুমি কি চিন্তা কর নাই (আলাম্‌ তারা) তোমার প্রভু (রাব্বূকা) কিরূপ (কাইফা) ব্যবহার করিয়াছিলেন (ফা-আ-লা) হাতীর (ফীল) অধিকারীগণের প্রতি (বে-আস্‌হাবে) ?

তুমি কি চিন্তা কর নাই, তোমার প্রভু হাতীর অধিকারীগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন ?

১। আলাম্ ইয়াজ্ আল্ কাইদা হুম্ ফী তাজ্ লীলিন্ ?

তিনি কি তাহাদের যুদ্ধসজ্জাকে (কাইদা) নিবুদ্ধিতাতে (তাজ্ লীলিন্) পরিণত করেন নাই (আলাম্ ইয়াজ্ আল্)?

তিনি কি তাহাদের যুদ্ধসজ্জাকে নিবুদ্ধিতাতে পরিণত করেন নাই ?

৩। ও-আ আবুসালা আলাইহিম্ তাইরান্ আবাবিলা ?

এবং তাহাদিগের বিরুদ্ধে (আলাইহিম্) তিনি কি উড্ডীয়মান পক্ষীর দল (তাইরান্ আবাবিলা) পাঠাইয়াছিলেন (আবুসালা) না ?

এবং তাহাদিগের বিরুদ্ধে তিনি কি উড্ডীয়মান পক্ষীর দল পাঠাইয়াছিলেন না ?

৪। তারমিহিম্ বেহিজারাতিন্ শ্বিন্ সিঞ্জিলিন্

এবং তাহাদিগকে কঠিন (বেহিজারাতিন্) প্রস্তরের উপর (সিঞ্জিলিন্) নিক্ষেপ করিয়াছিলেন (তারমিহিম্),

এবং তাহাদিগকে কঠিন প্রস্তরের উপরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন,

৫। ফা জা-আলাহুম্ কা-আস্-ফিন্ ম্বা'কুলিন্ ?

তাহাতে (ফা) তাহাদিগকে ভক্ষিত ঘাসের আকারে (মা'কুলিন্ কাআস্ফিন্) পরিণত করিলেন (জা-আলাহুম্) ।

তাহাতে তাহাদিগকে ভক্ষিত ঘাসের আকারে পরিণত করিলেন ? *

* মহম্মদের জন্মের বৎসর (খৃঃ ৫৭০) আবিসিনিয়ার খ্রীষ্টান রাজা এবং-
রাহা হস্তিদলসহ মক্কা আক্রমণ করেন। পথিমধ্যে তাহার সৈন্যদল বসন্ত
রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রস্তরময় ভূমিতে প্রাণত্যাগ করে, এবং পক্ষীদল
তাহাদের মাংস ভক্ষণ করে।

(১২) সূরা আল্-কদর (গৌরব) ।

বিস্মিল্লাহের রহমানের রহিম ।

১ । ইন্না আনজালনাহো ফী লাইলাতিল্ কাদরে

নিশ্চয় (ইন্না) এই কোরান্ আমি গৌরবান্বিত (কাদরে) রাত্ৰিতে
(ফী লাইলাতিল্) প্রকাশ করিয়াছি (আনজালনাহো) (সূরা ২ — ১৮৫
ও দেখ) ।

নিশ্চয় গৌরবান্বিত রাত্ৰিতে আমি এই কোরান্ প্রকাশ
করিয়াছি ।

২ । ও-আ মা আদ্রাকা মা লাইলাতৌল্ কাদরে ?

কিসে তোমাকে বুঝাইবে (আদ্রাকা) সেই গৌরবান্বিত রাত্ৰি
(লাইলাতৌল্ কাদরে) কি (মা) ?

কিসে তোমাকে বুঝাইবে সেই গৌরবান্বিত রাত্ৰি কি ?

৩ । লাইলাতৌল্ কাদরে খাইরৌন্ শ্বিন্ আল্ফে শাহরিন্ ।

সেই গৌরবান্বিত রাত্ৰি সহস্র (আল্ফে) মাস (শাহরিন্) হইতেও
উত্তম (খাইরৌন্), অর্থাৎ অজ্ঞানতার সহস্র মাস অপেক্ষা জ্ঞানোদয়ের
একরাত্ৰিও শ্রেষ্ঠ ।

সেই গৌরবান্বিত রাত্ৰি সহস্র মাস হইতেও উত্তম ।

৪ । তানাঞ্জালুল্ মালা-এ-কাতৌ ও-আন্নু রুহু ফীহা বে
এজ্নে রবেহিম্ শ্বিন্ কুল্লে আমূরিন্,

সেই রাত্রিতে (ফাঁ হা) ফিরিস্তাগণ (মালা-এ-কাভা) এবং ঈশ্বরের আত্মা (রুহ) * তাহাদের প্রভুর আদেশে (বে এফ্‌নে) সকল কার্যে (কুলে আম্বিন্) আবিভূত হয়।

সেই রাত্রিতে ফিরিস্তাগণ এবং ঈশ্বরের আত্মা তাহাদের প্রভুর আদেশে সকল কার্যেই আবিভূত হয়।

৫। সালামুন্ হি'আ হাদ্বা মাংলা-এল্ ফাজ্‌র ।

শান্তি (সালামুন্) ! সে (শান্তি) স্থির থাকে (জিয়া) দে পর্য্যন্ত না (হাদ্বা) প্রভাত (ফাজ্‌র) উদিত হয় (মাংলা-এ) (১১—১৩) ।

শান্তি ! তাহা প্রভাতের উদয় পর্য্যন্ত স্থির থাকে ।

* কোরান পুনঃ পুনঃ মানুষের ভিতরে পরমেশ্বরের আত্মার অবতরণে "রুহ্ন মিন্‌হো" (৪—১৭১) কথা বলিতেছে । তাহাতেই জীবন্ত দক্ষ লাভ হয় । সেই ঈশ্বরের রুহ্ প্রকাশ এক হইলেই দক্ষ মৃত :— "ইয়ুল্-করুহ্‌ মিন্‌ আমরেহি আলা মান্ ইয়াশা-উ মিন্ এবাদেহি" (১০—১৫) "পরমেশ্বর তাহার আদেশে তাহার দাসদিগের যাহার প্রতি ইচ্ছা করেন. তাহার প্রতি তাহার আত্মা প্রেরণ করেন ।"

ইসলাম ধর্ম

(১) ইসলাম ধর্মের রোকন বা স্তম্ভ-পঞ্চক ।

(ক) কলেমা বা ঈমান ।

ইসলাম ধর্ম পাঁচটি রোকন বা স্তম্ভের উপরে স্থাপিত । প্রথম স্তম্ভ কলেমা বা ঈমান । কেহ বলেন, কলেমা বা ঈমান পাঁচটি, কেহ বলেন চারিটি । প্রকৃত পক্ষে ইসলামের কলেমা বা ঈমান একটি বলাই ঠিক । তাই কলেমা তৈরি । তাই এই :-

লা (নাঈ) এলাহা (উপাস্য) ইল্লা (বাতীত) ইলাহ (পরমেশ্বর) মুহাম্মাদুর (মুহাম্মাদ) রাসূলো (প্রেরিত) ইলাহ (পরমেশ্বরের) ।

পরমেশ্বর ভিন্ন উপাস্য নাঈ । মুহাম্মদ তাহার প্রেরিত ।

এই কলেমা বা ঈমান-বচনের মূল আমরা কোরাণে এইরূপ পাঠতেছি :- হু-আ (তিনি) ইলাহী (যিনি) আবুসাল্লা (পাঠাইয়াছেন) রাসূলোহো (তাহার প্রেরিতকে), বেলেহদা (উপদেশের সহিত), ও-আ দীনেল্ হকে (এবং সত্যধর্মের সহিত), লে ইবুজ্ হিরা হো (যেন তাহা জয়যুক্ত হয়) আলা দীনে কুল্লেহি (অপর সকল ধর্মের উপরে) । মুহাম্মাদুন্ রাসূলো-ইলাহে (মুহাম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত) ১৪৮-১৮, ২৯। এই মর্মের

জায়াত বা মন্ত্ৰ * কোরাণে অনেক আছে (২১—১০৭) ।
 এ সকল কোরাণ-বচনের সহিত হিন্দু পাঠককে দুইটি গীতা-
 বচনের তুলনা করিতে অনুরোধ করি :—(১) “ধর্মসংস্থাপ-
 নার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে” (৪-৮), এবং (২) “যদ্ যদ্
 বিকৃতিমৎ সম্বৎ শ্রীমদৃর্জিতমব বা । তত্তদেবাবগচ্ছ স্বঃ মম
 তেজাঃশসম্ভবং” (১০—৪১) ॥ তাহা বলিয়া কেহ মহম্মদকে
 ঈশ্বরের অবতার মনে করিবেন না । কোরাণ পুনঃ পুনঃ
 বলিতেছে :—“তুমি বল (হে মহম্মদ), আমি তোমাদের মত
 মানুষ ভিন্ন নহি” (৪১—৬) : “আমি জানি না, যে আমার
 সম্বন্ধে, কি তোমাদের সম্বন্ধে, কি করা যাউবে” (৪৬—৯) ;
 “নিশ্চয় আমি তোমাদের ভাল করিতে কি হন্দ করিতে ক্ষমতা
 রাখি না” (৫২—২১) । মহম্মদ ততি সামান্ত পিতৃমাতৃহীন (এতিহ্য)
 • লোক ছিলেন । তিনি এত দরিদ্র ছিলেন, যে বিংশতি বয়স
 বয়ঃক্রমেও অর্থোপার্জন করিবার চেষ্টা মেহ-রাখালের কার্য্য করিতেন ।
 তাহার যখন চল্লিশ বৎসর বয়স, তখন তাহার নিকটে ঈশ্বরের
 প্রত্যাদেশরূপে কোরাণ প্রকাশিত হয় । তাহারই বলে, তিনি
 এমন চেতনা দিয়া গিয়াছেন, † বাহা পৃথিবীতে আর কেহ
 দিতে পারে নাই । কোরাণ বচনের সারমর্ম এবং
 গীতাবচনের সারমর্ম এক । আবার হিন্দু ও বলিতেছে

* ও-আ (এবং) মা আর্নাল্ নাকা (আমরা পাঠাই নাই তোমাকে)
 ইলা (ব্যতীত) রাহ্-গাতান্ (দয়াক্রমে) লিল্ আলাগিন্ (গানব গুলীর
 প্রতি, ২১-১০৭) † The Renaissance. See Carlyle's Heroes.

“সত্যমেব জয়তে, নানৃতং” (যুগুৎ) । কোরাণ ও বলিতেছে
 পরমেশ্বর “সতাধর্ম (দীনেল্ হকে) পাঠাইয়াছেন, যেন তাহা
 জয়যুক্ত হয় (ইবুজ্ হিরাহো)” * । কোরাণ বলিতেছে, “ইম্মা
 (নিশ্চয়) দীনা (ধর্ম), এন্দাল্লাহেল্ (ঈশ্বরের নিকটে)
 ইসলামো” (৩—১৮), “পরমেশ্বরের চক্ষে ইসলামই ধর্ম ।”
 এবং যাহা পরমেশ্বরের চক্ষে সত্য, তাহাই নিত্যা সত্য ।
 পরমেশ্বর কথনো “চারকে বলেন না, চুনি কর, গৃহস্থকে
 বলেন না সজাগ্ থক্,” বা মুসলমানকে বলেন না ইসলামই
 সত্য, আর হিন্দুকে বলেন না, ইসলাম মিথ্যা । সত্য কথনো
 এক ঠিক দুই হইতে পারে না । সত্য লাঠিকে মুসলমান
 বলিবে না ছাতি, : সত্য ছাটিকে হিন্দু ও বলিবে না লাঠি ।
 সত্যধর্মকে ও সেইরূপ হিন্দু ও বলিবে নত্যা, মুসলমানও বলিবে
 সত্য । সত্য ইসলাম ধর্মটি কি তবে সত্য হিন্দু ধর্ম নয়, সত্য
 হিন্দুধর্মটি কি তবে সত্য ইসলাম ধর্ম নয় ? পরমেশ্বর যখন এক,
 সত্য যখন এক, মানব প্রকৃতি যখন এক, তখন সতাধর্ম এক
 (ঈম্মাতান্ ও-আহদাতান্, ২১— ১২) না হইয়া যায় কোথায় ?
 কোরাণকে নূতন বেদজ্ঞানে কেন তবে আমরা সকলে মাথায়
 করিয়া নিব না ?

(গ) সালাৎ বা নমাজ বা উপাসনা ।

ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ সালাৎ বা নমাজ বা উপাসনা ।

* আ আল্ (আনিয়াছে) হকে (সত্য) ও-আ জাহাকাল্ (এবং দূর
 হইয়াছে) বাতেলো (মিথ্যা) ॥১৭—৮১১

কোরণ বলিতেছে :—

আকিমেস্ (হির রাখ) সানাতা (উপাসনা) মেহুসুক (অবরোহন হইতে) শাম্বে (সূর্যের) এনা গানাক (অন্ধকার পর্য্যন্ত) লাইনে (রাত্রি), ও-গাকুর (স্তোত্র-উচ্চারণ) আনালু ফাজুর (প্রাতের, ১৭—৭৮), ও-আ নিনা লাইনে (এবং রাত্রির কতক অংশের জন্য) কাতাহাজ্জাহ্ বেহি (তদ্বারা নিদ্রাত্যাগ করিবে), নাকেনাতান্ লাহা (যাহা তোমার প্রয়োজনের আভারক্) (১১—১২)।

উপাসনা.ক হির রাখ,—সূর্যের অবরোহন হইতে রাত্রির অন্ধকার পর্য্যন্ত, এবং প্রাতঃকালের স্তোত্র উচ্চারণ পর্য্যন্ত। রাত্রির ও কতক অংশের জন্য উপাসনাদ্বারা নিদ্রাত্যাগ কর, যে নিদ্রা তোমার প্রয়োজনের আভারক্ *।

কাহার উপাসনা ? (১) কোরণ উক্ত্য দিতেছে :—

• যিনি রেতঃ (মা তুমুনা) সৃষ্টি করেন, যিনি শম্বে অকুর (তাহুর সূনা) উৎপাদন করেন, যিনি জল (মা-আ) সৃষ্টি করেন, সেই তোমার মহান্ প্রাতপালকের (রবেকাল আজীম) নাম কাতন কর (৫৬—৫৮ হইতে ৭৪ আয়াত দেখ)

(২) কোরণ উক্ত্য দিতেছে :—যিনি রেতঃ সৃষ্টি করেন, যিনি শম্বে অকুর উৎপাদন করেন, যিনি জল সৃষ্টি করেন, সেই তোমার মহান্ প্রাতপালকের নাম কাতন কর।

কাসাব্বেহ্ (অতএব কাতন কর) বেমে (নাম) রাব্ বেকাল্ (তোমার প্রাতপালকের) আজীমে (যিনি মহান্) (৫৬—৭৪)।

* ১১—১১৪ ; ১৮—২৮ ; ২৫—৬৪ ; ৫২—৪৮, ৪৯ ; ৩০—১৭, ১৮ ; ৩২—১৬ ; ৩৩—৪২ ; ৫০—৫৯, ৪০ ; ৫৬—২৬—সূরা দ্রষ্টব্য।

অতএব তোমার মহান্ প্রতিপালকের নাম ক'র্তন কর ।

কাহার উপাসনা ? (৩) কোরাণ উত্তর দিতেছে :—

সেই পরমেশ্বরের “যিনি তিন উপাস্ত্র নাই, * যিনি নিত্য জীবিত এবং পরিবর্তন-রহিত (হায়ুল কাযুম), যাহাকে তন্দ্রা কি নিদ্রা স্পর্শ করে না । দু্যলোকে অথবা ভূলোকে যাহা কিছু আছে, সকলি তাহার + । তিনি জানেন যাহা তাহাদের সম্মুখ আছে, এবং যাহা তাহাদের পশ্চাতে আছে । তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহার অতিরিক্ত তাহার জ্ঞানের কোন বিষয়ে কেহ প্রবেশ লাভ করিতে পারে না । তাহার সিংহাসন (কুরসিয়ুহা) দু্যলোক এবং ভূলোকময় বিস্তৃত । এবং এই উভয়ের রক্ষাকার্যে, তাহার কোন আয়াস হয় না । তিনি মহান্” বা তিনি পরব্রহ্ম (২—২২৫—আয়াতুল্ কুসি) ।

কাহার উপাসনা ? (৪) কোরাণ উত্তর দিতেছে :—

যিনি দু্যলোক ভূলোকের সর্গাধ্যক্ষ, (বাদীযুস), যিনি সর্গজ (বেকুরে শাইয়িন্ আলীম) । তিনি আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক, সকলের রক্ষক (ও-আকীল) । দৃষ্টি (আবসারো) তাহাকে বুঝিতে পারে না (লা তুদ্রিকুহো), কিন্তু সকল দৃষ্টিকে তিনি নির্মিত করেন (ইয়ুজিকু) । ৬—১০২, ১০৩, ১০৪ । ”

কাহার উপাসনা ? (৫) কোরাণ উত্তর দিতেছে :—

যিনি দৃশ্য অদৃশ্য সকলের জাতা (২২), যিনি ব্যতীত উপাস্ত্র নাই. যিনি

* ন হিছদতো গিব'নো গির: সঘৎ, ঞখেন, ১ —৫৭—৪

+ “সুণেব জনা' উপাস্ত্রয়হ ॥ ঞখেন, ১—৫৯—১৭

রাজা (মালেকো), * যিনি পরম পবিত্র (কুদ্দুসো) (“শুক্লমপাপবিহ্বলং”), যিনি “শং” (ঋ, ১-৯০-৯) বা শাস্তিদাতা (মালামো), অভয়দাতা, † সকলের রক্ষক, সর্বশক্তিমান্ বিজ্ঞতা (আজিজোল্ জাব্বারো), সকল গর্হিতার আধার, মহা গৌরবাব্ধিত (সুব্হানাল্লাহে) । তিনি আল্লাহ্, তিনি সৃষ্টিকর্তা, প্রকাশকর্তা, নির্মানকর্তা, রূপদাতা ‡ । উক্তম নাম সকল (আস্মা-উল হসনা) তাহারই (লাহ) । দু্যলোকে অথবা ভুলোকে বাহ্য কিছু আছে, তাহারই স্তব করিতেছে (ইয়ুসাবেহ লাহ) । তিনি মহাশক্তি, মহা-জ্ঞানী ¶ । ৫৯—২২, ২৩, ২৪ ॥

কাহার উপাসনা ? (৬) কোরাণ উত্তর দিতেছে :—

যিনি সর্বোচ্চ (তা’ আলা), যিনি রাজা * (মালেকো), যিনি সত্যস্বরূপ ১ (হকো) (২০—১১৪) ॥

কোরাণ পুনঃ পুনঃ বলিতেছে পরমেশ্বর সত্যস্বরূপ “আল্লাহা হুবাল্ হাকু” ১ (৩১-৩০ ; ২২-৬ ; ২২-৬২) । “তিনি প্রকাশিত অপ্রকাশিত সকলি জানেন, “আলেমুল্ গাইবে ও-আশ্ শাহাদাতে” (৬৪-১৮) । কাহার উপাসনা ? “যে পরমেশ্বর মানুষের জীবনের শিরা অপেক্ষাও (মিন্ হাব্ লেল্ ও-আদিদ্)

* এক ইদ্রাজা জগতো বহুব, ঋ ১০—২২১—৩

† আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন, তৈ, ২-৪-১॥

‡ তৃষ্টা রূপাণি পিংশতু, ঋ ১০—১৮৪—১

¶ বেদা যো বীনাং পদমস্তরিক্ষেণ পততাং । বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ ॥
ঋ, ১—২৫—৭

১ ব্যাব্রবীষয়না মতে ভ্যোহয়িবিষি! ঋতচিহ্নি সত্যঃ ॥ ঋ, ১-১৪৫-৫॥

সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম, তৈ, ২—১—১ ।

মানুষের বেশি নিকটে (আক্রাবো এলাইহে)” (৫০-১৬) ।
 “যে স্থানেই তোমরা থাক, সে স্থানেই সেই পরমেশ্বর (আল্লাহ)
 তোমাদের সঙ্গে থাকেন (ও-আ হুবা মা-আ-কুম)” * (৫৭-৪) ।
 “সেই পরমেশ্বর মানুষের প্রার্থনা শুনেন, (ইম্মাকা সামী-উ দূ-
 আ-এ)” † ৩-৩৭ । তিনি লোকের প্রার্থনার উত্তম উত্তর-দাতা
 “নে’মাল মুজিবুনা” (৩৭-৭৫) । “তিনি বলেন—আমাকে
 ডাক আমি তোমাকে উত্তর দিব (উদুনী আস্তাজেব্ লাকুম)”
 (৪০-৬০) । আল্লাহ্ বলিতেছেন :—“যখন আমার উপাসকগণ
 তোমাকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করে, তখন নিশ্চয় আমি
 নিকটে থাকি, আমি প্রার্থীর প্রার্থনার উত্তর দেই (ইয়াস্তাজীবু),
 অতএব আমার ডাকে তাহাদের উত্তর দেওয়া উচিত, এবং
 আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত । তাহা হইলেই তাহারা
 ঠিক পথ পাইবে” ॥২-১৮৬ ॥

‘দু্যলোকে অথবা ভুলোকে যাহা কিছু আছে, সকলে
 আল্লাহ বা পরমেশ্বরের স্তুব করে (সাব্বাহা লিল্লাহে) ‡ ।
 তিনি মহাশক্তি মহাজ্ঞানী । দু্যলোকে ও ভুলোকের রাজত্ব
 (মুল্কো) তাহারই । তিনি জন্মমৃত্যুর বিধাতা । সকলের
 উপরে তাহারই শক্তি । তিনি আদি, তিনি অন্ত, (আওয়ালো
 ও-আল্ আখেরো)’ ¶ ॥ ৫৭-১,২,৩ ॥

* ধৌ সংনিবন্ত বস্মজয়েতে রাজা তদ্ বেদ বরুণস্তুতীরঃ ॥ অথর্ক, ৪-১৬-২ ॥

† আ অংকর্ণ অধী হবং নুচ্চিধিষ মে গিরঃ ॥ ঋ, ১-১০-২

‡ এতাবনস্ত মহিমাতো জ্যাঘাংচ পুরুষঃ ॥ ১৩-২০-৩ ॥

¶ নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিবরুপ ॥ গীতা, ১১-১৬

এই সকল কথা পর্যালোচনা করিয়া কোন্ হিন্দু বলিবে, যে মুসলমান যে আল্লাহের উপাসক, হিন্দু সেই আল্লাহের উপাসক নয়, বা আল্লাহ্ এবং পরমেশ্বর এক নয়, বলিবে যে মুসলমানের কোরাণ এবং হিন্দুর বেদোপনিষদ্ এক নয়। কে বলিবে যে কোরাণ হিন্দুর পঞ্চম বেদ নয়? কোন্ হিন্দু বলিবে, কোরাণের সালাৎ বা নমাজ বেদোপনিষদের ব্রহ্মোপাসনা নয়,-- “সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শাক্ত উপাসীত” নয়? কোরাণ ও বারবার বলিতেছে, যে মানবমণ্ডলী এক ধর্ম-সম্প্রদায় ভিন্ন নয় (মা কানা মাসো ইল্লা উম্মাতান্ ৬-আহদাতান্) (১০-১৯ : ১৩-১২, ৫৩ * : ৩০-৩১, ৩২) । আমাদের বিখ্যাত “সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্ম-মন্দিরং” মুস্ত কি তবে ঐ কোরাণ-বচনেরই প্রতিধ্বনি নয় ?

এস্থলে ‘নমাজ’ শব্দের ইতিহাসের প্রতি আমরা হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর পাঠকের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করি। সাধারণ মুসলমান শুনিলে বিস্মিত হইবে যে, তাহাদের এত প্রিয় নাম ‘নমাজ’ (সালাৎ) ও ‘রোজা’ (সিয়ামো) শব্দদ্বয় আরবি শব্দই নয়। কোরাণে “নমাজ” শব্দ নাই।

* “নিশ্চয় তোমাদের এই ধর্মমণ্ডলী একমাত্র ধর্মমণ্ডলী, এবং আমি তোমাদের প্রতিপালক ; অতএব আমাকে ভয় কর। ৫২। অনন্তর তাহারা আপনাদের মধ্যে আপনাদের কার্য খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিল, প্রত্যেক সম্প্রদায় যাহা তাহাদের নিকটে আছে, তাহাতে আনন্দিত।” হায়, এখন কিনা মুসলমানদের মধ্যে শিষ্য-গুরি পরস্পরকে মুসলমান বলিয়া স্বীকার করিতে ও কুণ্ঠিত হয় !

হজরত মুহম্মদ নমাজ কি রোজা শব্দদ্বয় ব্যবহার করেন নাই ।
বস্তুতঃ “নমাজ” শব্দ পার্শি শব্দ । কোরাণ আবি । আবি
কোরাণে পার্শি “নমাজ” শব্দ থাকার কোন কারণই নাই ।
কোরাণে ঈশ্বরোপাসনা অর্থে আরবি ‘সালাৎ’ শব্দ ব্যবহৃত
হইয়াছে । তাহার প্রতিশব্দরূপে পার্শি নমাজ শব্দ ব্যবহার
করা, আর বাঙ্গলা ‘উপাসনা’ শব্দ ব্যবহার করা, উভয়ই তুল্য ।
বাঙ্গলার অধিকাংশ মুসলমানই আরবি ভাষা বুঝে না, পার্শি ও
বুঝে না, কিন্তু বাংলা বুঝে ; তথাপি তাহারা তাহাদের সালাৎ
বা ঈশ্বরোপাসনায় বা নমাজে আরবির সঙ্গে, লোককে বুঝাইবার
জন্য, বাঙ্গলা ভাষা ব্যবহার করা উচিত মনে করে না, যদিও
‘নমাজ’ শব্দই আরবি নয়, কোরাণে নাই । বস্তুতঃ কোরাণ
স্পর্শই বলিতেছে, লোক যে ভাষা বুঝে, সেই ভাষাতেই তাহাকে
কোরাণ দেওয়া উচিত ; ঈশ্বরোপাসনাতে ও কি তাহার পক্ষে,
যে ভাষা সে বুঝে সেই ভাষাই ব্যবহার করা উচিত নয় ? তাহা
করিলে হিন্দুও মুসলমানের সহিত নমাজে যোগ দিতে পারে ।
আমরা জানি অনেক কৃতবিদ্য গণ্যমান্য হিন্দু তাহা করিতে ইচ্ছা
করেন । কোরাণ ও আপনার সম্বন্ধে বলিতেছে :—“ইহা এমন
একটি কিতাব যাহার আয়াত বা উপদেশগুলি সকলে বুঝিতে
পারে (ফুসেল্লাৎ) ; ইহা আরবি কোরাণ এমন সকল লোকের
জন্য যাহারা আরবি জানে (লেকাউমিন্ ইয়্যালামুনা) (৪১-৩)।”
আবার বলিতেছে, “আমরা যদি বিদেশীয় ভাষায় কোরাণ
করিতাম, তবে নিশ্চয় তাহারা বলিত, কেন ইহার উপদেশসকল

এমন করা হয় নাই, যে সকলেই বুঝে ? কি আশ্চর্য্য, ভাষা বিদেশীয়, আর লোক আরবি” (৪১-৪৪) ! পূর্বে ও বলা হইয়াছে, কোরাণ সম্বন্ধে পরমেশ্বর বলিতেছেন :—“নিশ্চয় আমরা ইহাকে আরবি কোরাণ করিয়াছি, যেন তোমরা ইহা বুঝিতে পার” (৪৩-৩)। বস্তুতঃ কোরাণ বারবার “মানবজাতির জন্য উপদেশ”, “হুদান্ লিল্লিনাসে” (২-১৮৫) বলিয়া, আপনার পরিচয় দিতেছেন, এবং প্রত্যেক মুসলমানের ইহা বিশেষ কর্তব্য, যে পৃথিবীর সকল জাতির নিকটে, বাহার যে ভাষা সেই ভাষায়, সকলের নিকটে কোরাণ উপস্থিত করে। কোরাণ নিজে বলিতেছেন, যে ইহা “জগতের জাতিসকলের জন্য সতর্ককারী উপদেশ,” “জেকুরূন্ লিল্ আলামীন” (৬৮-৫২ ; ৩৮-৮৭ ; ৪১-৩ ; ৪২-৭ ; ৪৬-১২ দেখ)।

• যাহা হউক, হিন্দু-মুসলমান সকলেরই ইহা জানা কর্তব্য, যে ইসলাম ধর্মে অধুনা সুপ্রতিষ্ঠিত ‘নমাজ’ শব্দ পার্শি শব্দ, এবং পার্শি ভাষা সংস্কৃতেরই অতি প্রাচীন সহোদর। “নমাজ” শব্দের মূল বৈদিক “নমস্” শব্দ। হিন্দু-মুসলমানকে একত্রে বান্ধিবার জন্য যেন পরমেশ্বর এই ‘নমাজ’ শব্দকে তাঁহারই একটি ঐশ্বরিক বন্ধন-রজ্জুরূপে (হাব্লে ল্লাহে, ৩-১০২) ধরাতলে অবতীর্ণ করিয়াছেন। উভয়ের একই ব্যুৎপত্তি, একই অর্থ। বেদের নিরুক্তকার ‘নমস্’ শব্দের ব্যুৎপত্তি করিতেছেন :— “নম্যতে দেবতাত্বাৎ, নমস্ত্যানেন হেতুনা” ইত্যাদি ; অর্থাৎ যাহা দ্বারা অনুকূল (প্রহস) করা যায়। উপাসনাদ্বারা

পরমেশ্বরকে অনুকূল করা যায় ; সেজন্য পরমেশ্বরের উপাসনার নাম “নমঃ” বা নমাজ । এখন কেবল ‘মস্তক অবনত করা’ বা ‘সেজদা’ করাকেই হিন্দু ‘নমঃ’ বা ‘নমস্কার’ বলে । এমন কি হাত উঠানকে ও আজকাল নমস্কার বলে । কিন্তু বেদে ‘নমঃ’ অর্থ ‘নমাজ’ বা ‘স্তুবস্তুতি’ বা উপাসনা, যথা “ইমা ব্রহ্মাণি বর্ধনা-
 ষ্ঠিত্যাং সন্ত শস্তুমা । যা তক্ষাম রথ্যা ইবাবোচাম রহন্নমঃ”
 ॥৫-৭৩-১০ “এই সকল স্তোত্র (ব্রহ্মাণি), যাহাতে দিবারাত্রি-
 রূপে প্রকাশিত পরমেশ্বরের (অষ্টভিাং) মহিমা কীর্তিত
 হইয়াছে (বর্ধনা), তাহা ঠাহার প্রীতিকর হটক (শস্তুমা) ।
 শিল্পি যেমন রথ নির্মাণ করে, সেইরূপ যত্নের সহিত ইহা
 রচিত । এই বৃহদাকার স্তুব (নমঃ) উচ্চারণ করিতেছি
 (অবোচাম)” । আবার অগস্ত্য পরম জ্যোতির্ময় পরমেশ্বরের
 (অগ্নে) স্তুব করিয়া বলিতেছেন :- “অগ্নে নয় সুপথা রায়ে
 অশ্মাশ্বিনানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্ । যুযোধাস্মজ্জুহুরাণামেনো
 ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম” (১-১৮৯-১) । “হে বিশ্ব-
 প্রকাশক (দেব) জ্যোতির্ময় পরমেশ্বর (অগ্নে), তুমি
 সকল ধর্ম (বয়ুনানি) জান (বিদ্বান্), আমাদিগকে ভাল পথে
 (সুপথা) মঙ্গলের দিকে (রায়ে) লইয়া যাও ; কুটিল-
 পথগামী (জুহুরাণং) পাপ (এনঃ) আমাদিগ হইতে দূর কর,
 (যুযোধি) । বৃহদাকার (ভূয়িষ্ঠাং) স্তুতিবাক্য উচ্চারণদ্বারা
 (নমঃউক্তিং) আমরা তোমার সেবা করিতেছি (বিধেম)” ।

(গ) রোজা বা উপবাস-ব্রত ।

কোরাণে বলা হইতেছে :—“হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের জন্য উপবাসের বিধি দেওয়া হইল, যেমন তোমাদের পূর্ব-বর্তীদের জন্য সে বিষয়ে বিধি দেওয়া হইয়াছিল, যেন তোমরা ধৈর্যশালী হও,” (১-১৮৩) । মুসা (২-৫১) এবং ঈশা ও চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত্রি উপবাসী ছিলেন । মুসলমানের জন্য কতদিনের উপবাস বিধি, তাহার ঠিক দিনের সংখ্যা নির্দেশ না করিয়া, কোরান যেন মুসলমানের ব্যক্তিগত সুবিচারের উপরে সে ভার রাখিয়াছেন । কোরাণ শুধু বলিতেছেন—“কতিপয় দিবসের জন্য” “আয়্যামান্ ম্মা’-দুদাতিন্” (২-১৮৪) উপবাস (.সেয়ামো) । পরে বলিতেছেন :—“যদি তোমরা বুঝ, তবে তোমাদের পক্ষে উপবাস করাই শ্রেয়ঃ” । অর্থাৎ যে বুঝিতে অক্ষম, তাহার জন্য অক্ষর মত উপবাস করা কোরানের বিধি নয় । কোরাণ বলিতেছেন :—“রমজান মাসেই কোরাণের (প্রথম) প্রকাশ, যেন মানুষ পথ চিনিয়া চলিতে পারে । তাই তোমাদের মধ্যে যে কেহ ঐ মাসে উপস্থিত থাকিবে, সে অবশ্য সেই মাসে উপবাস করিবে (শাহ্-রা ফাল্ ইয়াসুম্-হো)” । এইরূপে উপবাসব্রতের বিধান দিয়া, কোরাণ সেই সঙ্গেই বলিতেছে :—“পরমেশ্বর তোমাদের পক্ষে যাহা সহজ হয়, তাহাই ইচ্ছা করেন, যাহা কষ্টকর তাহা ইচ্ছা করেন না ।” “যদি তোমরা বুঝ—(ইন্ কুস্তুম্ তা’ লামুনা,) তবে উপবাস করা

তোমাদের পক্ষে ভাল”, (ও-আ আন-তামুমু খাইকুন-লাকুম) (২-১৮৪), এ কথার মর্ম পরিগ্রহ করা সকলেরই কর্তব্য । কোরাণ স্পষ্টই বলিতেছে (২-১৮৩), বৈশাখালী (লা-আল্ল-কুমু তাত্তাকুনা) হওয়াই উপবাস ব্রত বা রোজার লক্ষ্য । তাহার জন্যই ‘স্মিয়ামো’ বা রোজা বা উপবাসের বিধি । পাঠক একথাও ভুলিবেন না, যে নমাজ শব্দের ন্যায়, রোজা শব্দও পার্শি, কোরাণে নাই ।

রোজার (সিয়ামা) কালসম্বন্ধ কোরাণ বলিতেছে, যতক্ষণ প্রভাতে দিবালোকের শুভ্রতা রাত্রির অন্ধকার হইতে ভিন্নরূপে লক্ষিত না হয়, ততক্ষণ আহার কর, পান কর, তৎপর রাত্রি পর্যন্ত উপবাস পূর্ণ কর (“আতিমুস্ সিয়ামা এলা ল্লাইলে”- ১৮৭) । মানবজাতি ইতঃপূর্বে ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন ছিল (Dark Ages) : রমজান মাসের ২৭ তারিখ রাত্রিতে কোরাণ প্রথমে অবতীর্ণ হয় । সেই রাত্রির নাম “লাইলাতেল কাদরে” বা “শবে-কদর,” অর্থাৎ গৌরবাস্বিত রাত্রি । সূরা কদরে (৯৭) কোরাণ বলিতেছে :—“ইন্ন আন-জাল-নাহা ফী লাইলাতেল-কাদরে,” “নিশ্চয় আমরা গৌরবাস্বিত রাত্রিতে ইহা (কোরাণ) অবতীর্ণ করিয়াছি ।” আবার সূরা দুখানে (৪৪) বলা হইতেছে :—“সত্যপ্রকাশক গ্রন্থ স্মরণ কর । নিশ্চয় আমরা শুভ রাত্রিতে উহা অবতীর্ণ করিয়াছি”, ইত্যাদি (৪৪—৩,৪) । রমজান মাসে কোরাণ প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া, ঐ মাসে কতিপয় দিবস—“আয়্যামান্-স্মা’দুদাতিন্”—মুসলমান-

দিগের জন্য উপবাস করিবার বিধি, 'আলাইকুম্ সিয়ামো কুতেবা।'

তবে মুসলমানকে বুঝিতে হইবে, যে উপবাস বা রোজা ধৈর্য-লাভের উপায় মাত্র— "লা আল্লাকুম্ তাত্তাকুনা" (২-১৮৩), এবং জানিয়া শুনিয়া ধৈর্যলাভের উদ্দেশ্যেই রোজা রাখিতে হয়। বস্তুতঃ না জানিয়া, না বুঝিয়া, কোন কার্য করা কোরণে নিষেধ, "ও-আ লা তাক্ফু মা লাইসা লাকা বেহি এল্-মুন" (১৭-৩৬)। সকল ধর্ম্মেই উপবাসের বিধি আছে। মুসা এবং ইসার কথা সকলেই জানেন। এমন কি বুদ্ধও উপবাসের পর মারদ্বারা পরীক্ষিত হইয়া, পরে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। ঋগ্বেদেও দেখা যায়, অগস্তা এবং লোপামুদ্রা দীর্ঘকাল উপবাসাদি ব্রতপালনদ্বারা শরীর সংযত করিয়াছিলেন,— "পূর্বীরহঃ শরদঃ শশ্রমাণা দাষা বস্তাক্ষসো জরয়ন্তীঃ" ইত্যাদি (১-১৭৯-১), (হে অগস্তা), "আমি অনেক বৎসর দিবারাত্রি এবং জরার উৎপাদক ঊষাকালে সংযম ব্রত পালন করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়াছি"। "ব্রাহ্মণা ব্রতচারিণঃ" (ঋ, ৭-১০৩-১), "যাঁহারা পরমেশ্বরের স্তুত্ব করেন, তাঁহারা উপবাসাদি ব্রত পালন করেন।" উপনিষদ্ ও বলিতেছে : "তন্নতঃ বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি নাজ্জন দানেন তপসাহনাশকেন"—(রূ, ৪-৪-২২), "ঈশ্বরোপাসক সেই সর্বেশ্বরকে বেদাধ্যয়ন, পূজা, দান, এবং উপবাসাদিব্রত সাধনদ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন।" বেদোপনিষদের এই সকল কথাই সমর্থন করিয়া কোরণ ও বলিতেছে যে "তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকেও এই উপবাস বিধি দেওয়া হইয়াছিল,"— "কামা

কুতেবা আলা ল্লাজিনা মিন্ কাব্লে কুম্” (২-১৮৩) । ইহাও সকলেরই জানা কর্তব্য, যে কোরাণ বেদোপনিষদের ঋষিকে অস্বীকার করা দূরে থাকুক, পুনঃপুনঃ বলিতেছে, “নিশ্চয় প্রাচীন লোকদিগের অধিকাংশ বিপথে গিয়াছিল । সত্য সত্যই আমি তাহাদের মধ্যে সতর্ককারী পাঠাইয়াছিলাম ” সাক্ফাত (৩৭)—৭১, ৭২ । “নিশ্চয় তোমার পূর্বে প্রেরিত পুরুষ (রুসুলান্) প্রেরণ করিয়াছি । তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আছে যাহাদের সম্বন্ধে তোমার নিকটে উল্লেখ করিয়াছি : এবং তাহাদের মধ্যে অল্প কেহ আছে, যাহাদের সম্বন্ধে তোমার নিকটে উল্লেখ করি নাই,” মুমেন (৪০)— ৭৮ । (হে মহম্মদ) “তোমার নিকটে এমন কিছু বলা হইতেছে না, যাহা তোমার পূর্ববর্তী প্রেরিত পুরুষদিগকে বলা হয় নাই,” হামিম্ (৪১)—৪৩) । “নিশ্চয় প্রত্যেক জাতি মধ্যে এক একজন প্রেরিত পুরুষ প্রেরণ করিয়াছি,—এইকথা বলিবার জন্য, যে পরমেশ্বরের সেবা করিও, এবং মূর্তিপূজা হইতে বিরত থাকিও” (নহল (১৬)—৩৬) । “নিশ্চয় ইহা (কোরাণ) জগতের প্রভুর নিকট হইতে প্রকাশিত । বিশ্বাসী আত্মা (রুহুল্ আমিনা) ইহা লইয়া আসিয়াছে,—তোমার হৃদয়ে ইহা লইয়া আসিয়াছে, যেন তুমি সতর্ককারীদের মধ্যে একজন হও,—প্রচলিত আরবি ভাষায়, এবং নিশ্চয় ইহা প্রাচীনদের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে আছে” ॥ শো-অর(২৬) ১৯২ হইতে ১৯৬ ॥ হিন্দু মুসলমানে বিবাদ কি তবে অন্ধকার ঘরে রজ্জুতে সর্পভ্রমর্তুল্য নয় ? যাহা হউক, কোরাণে পাপের

প্রায়শ্চিত্তরূপে উপবাসের বিধান, এবং উপবাসের পরিবর্তে দরিদ্রকে অন্নদানের ব্যবস্থা, রোজা সম্বন্ধে যেমন, সেইরূপ কোরাণের অন্যান্য স্থানেও দৃষ্ট হয় (৫৮-৪)। বস্তুতঃ দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর আদি হইতেই উপবাস-বিধি প্রচলিত * । তবে দেশকালপাত্র অনুসারে উপবাসের রূপভেদ ও সর্বত্রই দৃষ্ট হয় । আবার কোরাণ প্রকাশের সময়ের মুসলমানদিগকে আত্মরক্ষার জন্য কত সময় সারা দিন যুক্ত করিতে হইত, এবং সূর্যাস্তের পর আহার করিতে হইত । এক মাসের জন্য এই উপবাস ব্রত বা রোজা সাধন সে কালের সে দেশের মুসলমানদের জন্য কত প্রয়োজন ছিল, তাহা দৃষ্টেই ইহা অনুমান করা যায় । কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, এ কালের এবং এ দেশের আফিসাদিতে

• নিযুক্ত মুসলমানদের জন্য ও কি এই রোজা বা উপবাসব্রত সেইরূপই প্রয়োজন ? কোরাণ নিজেই আপনার সম্বন্ধে বলিতেছে : “সেই তিনিই (আল্লাহ্) তোমার নিকটে এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন । ইহার কতগুলি মন্ত্র (আয়াতুন্) নিত্য সত্য বা অপরিবর্তনীয় (মুহ্ কামাতুন্) । তাহাই গ্রন্থের মূল (হুমা উম্মুল্ কিতাবে), এবং অন্যগুলি সাদৃশ্যমাত্র (উখারো মুতাশাবেহাতুন্) । তবে যাহাদের হৃদয়ে কপটভাব (জাইগুন্) আছে তাহারা গ্রন্থের সেই অংশেরই অনুসরণ করে, যাহা সাদৃশ্যমাত্র । তদ্বারা লোককে পথভ্রান্ত করিতে (ফেৎনাতে)

* “Spare Fast, that oft with gods doth diet” Milton’s Il penseroso.

চেষ্টা করে, এবং নিজের রুচি মত তাহার বাখা করে। কিন্তু পরমেশ্বর ভিন্ন কেহ তাহার প্রকৃত মর্ম জানেন না, অর্থাৎ তিনি না বুঝাইলে, কেহ তাহার প্রকৃত মর্ম বুঝে না” (৫-৬)। এস্থলে দেখা যায়, কোরান নিজেই দুই প্রকার আয়াতের উল্লেখ করিতেছে : -(১) নিতা সত্য (মুহ্ কামাতুন্), যাহা কোরানের মূলস্বরূপ, “হুন্নী উম্মুল্ কেতাবে,” এবং (২) সাদৃশ্য বা রূপকমাত্র (মুতাশাবেহাতুন্), যাহা দেশকাল পাত্রভেদে পরিবর্তিত করিতে হয় ; রোজা সম্বন্ধে দেখা যায়, কোরান নিজেই দেশকালপাত্রভেদে নানা প্রকার রূপান্তরের ব্যবস্থা করিতেছে, যথা, “কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে রুগ্ন, অথবা পথভ্রমণে আছে, সে অন্য কতিপয় দিন উপবাস করিবে,” “যে পারে সে উপবাসের পরিবর্তে একজন দরিদ্রকে খাওয়াইবে।” ইত্যাদি। স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে রোজার ব্যবস্থা সাদৃশ্যমাত্র, “মুতাশাবেহাতুন্”, এবং দেশকাল-পাত্রভেদে পরিবর্তনযোগ্য। এ অবস্থাতে রোজাকে ইসলাম ধর্মের স্তম্ভের বা “উম্মুল্ কেতাবে” মধ্যে গণ্য করা কি সম্ভব ? অপরদিকে কোরান পুনঃপুনঃ বলিতেছে :- “হে বিশ্বাসীগণ, কেন তোমরা যাহা কর না, তাহা বল। ইহা পরমেশ্বরের নিকটে অত্যন্ত বিরক্তিকর, যে তোমরা এমন কথা বল, যাহা তোমরা কর না।” ৬১-২,৩ আবার “হে বিশ্বাসীগণ, ঈশ্বাকে রক্ষা কর, ঈশ্বরের অনুরোধে তোমার নিজের বিরুদ্ধে, কি তোমার পিতামাতা কি আত্মীয়ের বিরুদ্ধে ঈশ্বাকে রক্ষা কর” ইত্যাদি (৪-১৩৫)। “হে বিশ্বাসীগণ, ঈশ্বরের অনুরোধে

সত্য-পরায়ণ হও, শ্রীমানুসারে সাক্ষ্য দেও, শত্রুতা আছে বুলিয়া, কাহারো প্রতি শ্রীয়াচরণ হইতে বিরত থাকিও না” ইত্যাদি (৫-৮); “যখন তোমরা কথা বল, আত্মীয়ের বিরুদ্ধে হইলেও শ্রীয়াসঙ্গত কথা বলিও” (৬-১৫৩)। “সত্যের সঙ্গে অসত্য মিশ্রিত করিও না, এবং সত্য গোপন করিও না,—যখন তোমরা তাহা জান : এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ জকাত প্রদান কর, ও সকলের সঙ্গে ঈশ্বরকে নমস্কার কর” (২-৪২, ৪৩)। শ্রীয়াসঙ্গত এবং সত্য কথা বলা যে মুসলোমের একান্ত কর্তব্য, কোরান বারবার তাহার উল্লেখ করিতেছে *। কিন্তু রোজারক্ষার কর্তব্যতা সম্বন্ধে সূরা বকরার দুইটি আয়াতে ভিন্ন (২-১৮৩, ১৯৬), অন্য কোন সূরাতে কোরান উল্লেখ করে নাট। এরূপ অবস্থায় সত্য এবং শ্রীয়াসঙ্গত ইসলাম ধর্মের প্রকৃত স্তম্ভ মনে করিতে হয়, রোজাকে নয়। কিন্তু হায়, বাংলার মকদ্দমাপ্রিয় মুসলমান কি করিতেছে ! বস্তুতঃ শ্রীয়া এবং সত্যই প্রকৃত ধর্মের ভিত্তি। ঈয়াদেও (৭-১০৪-১২, ১৩) দেখা যায়, ঈযি বসিষ্ঠ বলিতেছেন,

* শ্রীয়াসঙ্গত সত্যবাক্য বলা সম্বন্ধে নিম্নে প্রদর্শিত সূরা ও আয়াতসকল দেখ :—

ফাতেহা (১)—৫ । বকরাহ্ (২)—৪২, ১৮৮, ২৮৩ । নিসা (৪)—
১৩৫ । মাইদাহ্ (৫)—৮ । নাহল (১৬)—১১৬ । বানি ইস্রাইল (১৭)—
৮১ । আন্বিয়া (২১)—১৮ । কুরআন (২৫)—৭২ । শু-আরা (২৬)—
২১১ হইতে ২২৬ । সাদ (৩৮)—৪৪ । জুমার (৩৯)—৩৩ হইতে ৩৫ ।
নজম্ (৫৩)—২৮ । হাশর (৫৯)—৮ । সাফ্ফ (৬১)—২, ৩ । মা'আরিজ
(৭০)—৩৩ হইতে ৩৫ ।

“বিদ্বান্গণ ইহা অবগত হউন. যে সত্য এবং অসত্য বাক্যদ্বয় পরস্পর জয়লাভার্থ স্পর্ধা করিতেছে। এই উভয়ের মধ্যে যাহা সত্য, যাহা সরল, ভগবৎ-প্রেরণা (সোম) তাহাকেই রক্ষা করেন। তিনি অসত্যকে বধ করেন। ভগবৎ-প্রেরণা (সোম) পাপকারীকে চালনা করে না, মিথ্যাচারী বলশালীকেও চালনা করে না। তিনি মিথ্যাবাদীকে এবং স্বার্থাক্ষ নিষ্ঠুরদিগকে (রক্ষঃ) বধ করেন। তাহারা উভয়ে পরমেশ্বরের হাতে বন্দী হইয়া আছে।” বেদের সোম সঙ্ঘকে আমাদের ঋগ্বেদ (২, পৃঃ ১২৬ হইতে ১৩০) দেখিবেন। সত্যই, দেখা যায়, কোরাণের ঋয়, বেদের বা হিন্দুধর্মের ও স্তম্ভস্বরূপ। সত্য যেমন এক, বেদ-কোরাণও এক, প্রকৃত হিন্দু-মুসলমানও এক। আবার ইসলাম ধর্মের আর একটি স্তম্ভ ঈশ্বর-বিশ্বাস ও লোকের হিতসাধন। পরমেশ্বরের বিশ্বাস এবং সৎকর্মের অনুষ্ঠান সঙ্ঘকে ও কোরাণ বারবার বলিতেছে :-

“ইন্নাল্লাতীনা আমানু ও-আ আমলুস্ সালেহাতে উলায়েকা হুম্ব খয়েরুল্ বারিয়্যাতে” (৯৮-৭), “নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাসী এবং সৎকর্মশালী, তাহারাই মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।” কোন্ হিন্দু বলিবে, যে ইহাট প্রকৃত হিন্দুধর্ম নয় ? ‘রোজা’ কি ‘হজ্’ ইত্যাদি সঙ্ঘকে এমন জোরের কথা কোরাণে পাঠি না। “তোমরা পূর্বদিকে অথবা পশ্চিমদিকে মুখ ফিরাও, (ওজুহাকুম কেবলাল্ মাশ্-রেকে ও আল্ মাগ্-রেবে) তাহাতে পুণ্য নাই : পুণ্য ইহাতে যে তোমরা ঈশ্বরে, শেষ বিচারের

দিনে, ফিরিস্তাগণে, গ্রন্থে এবং প্রেরিতগণে বিশ্বাস কর, ঈশ্বরে অনুরাগযুক্ত হইয়া ধন দান কর,—আত্মীয়দিগকে, অনাথ-দিগকে, দরিদ্রদিগকে, পথিকদিগকে, ভিক্ষুকদিগকে, ও দাসদিগের দাসত্ব মোচনার্থ : এবং যে উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং উকাত দান করে, এবং প্রতিজ্ঞা করিলে প্রতিজ্ঞাপালন করে, এবং বিপদে, কষ্টে, এবং যুদ্ধে ঐর্ধ্যশালী হয় ইহারাই যাহারা সত্যে আছে, এবং পুণ্যব্রত রক্ষা করিতেছে” (২-১৭৭)। “কোরানের মর্ম্মমতে সরলতা, ঈশ্বরের অধীনতা, ঈশ্বরের এবং লোকের সেবা, সত্যাপরায়ণতা, উপাসনা, এবং দরিদ্রের সাহায্য করা, ইত্যাদিই নিত্য সত্য। তাহাই ইসলামধর্ম্মের প্রকৃত রোকন বা স্তম্ভ। তাহাষ্ট হিন্দুধর্ম্মের এবং সকল সত্যধর্ম্মের মূল। কোরান্ বলিতেছে, “লা এক্কাহা ফীদ্দিনে” (বকারাহ্, ২-২৫৬), “ধর্ম্মবিষয়ে বলপ্রয়োগের স্থান নাই”। “৬-আ মা আত্মা আলাইহিম্ বে-জাব্বারিন্” (সুরা কাফ (৫০)---৪৫), “তাহাদের সম্বন্ধে বলপ্রয়োগ করিবার ভূমি কেহ নও”। রোজার কথা বলিয়াই, কোরান যেন বঙ্গীয় মুসলমানকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে :— “তোমরা অন্যায়রূপে একে অন্যের সম্পত্তি গ্রাস করিও না, এবং তাহা লইয়া আদালত পর্য্যন্ত উপস্থিত হইও না (“৬-আ তুদলু বেহা এলাল্ হুকামে”), তাহা হইলে অন্যায়রূপে

লোকের সমগ্র সম্পত্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া খাটয়া ফেলিবে, অথচ তোমরা ইহা জানিতেছ” *(বকরাহ্ ২-১৮৮)। কোরান বলিতেছে “বিশ্বাসীদের মধ্যে যদি দুই পক্ষে বিবাদ হয়, তাহাদের মধ্যে আপোষ করাইবে (আস্লেহ্)”। “বিশ্বাসীরা পরস্পর ভাই ভিন্ন নহে, অতএব তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ করাইবে, এবং পরমেশ্বরকে ভয় করিবে, যেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করেন” (হুজুরাত (৪৯)-২,১০)†। আর বঙ্গীয় মুসলমানগণ যেন কোরাণকে অমান্য করিয়া পরস্পর মামলা করিয়া, ইসলামকে কলঙ্কিত করিতেছে, কাফের উকিলের শিক্ষামত মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া মুসলমান মুসলমানকে সর্বস্বান্ত করিতেছে, মুসলমানের জমি-বাড়ী মুসলমান বিক্রি করাইতেছে, আর মুসলমানের টাকাতে হিন্দু উকিলবন্ধুর বাড়ীতে ত্রিতল এমারত উঠিবার সাহায্য করিতেছে ! ইহার ফলে হিন্দুধর্ম মুসলমান-বিদ্বেষ এবং মুসলমানধর্ম হিন্দু-বিদ্বেষ পরিণত হইয়াছে ! হায়, কবে মুসলমান রোজার পরিবর্তে সত্যকে এবং সংকর্ষকে ইসলাম ধর্মের স্তম্ভ মনে করিবে ! কবে মুসলমান কোরান মত চলিয়া প্রকৃত মুসলমান হইবে ? “বেদোহখিলো ধর্মমূলং হি,”—হিন্দু ও বেদমত চলিয়া কবে প্রকৃত হিন্দু হইবে !

* সূরা বকরাহ্ :—“ও-আ লা তা'কুলু আম্ ও-আলা কুলু বাইনাকুলু বেল্বাতেলে ও-আ তুদুলু লেহা এলাল্ হুকামে লে তা'কুলু ফারিকান্ যিন্ আম্ ও-আলেন্নাসে বেল্ ইস্মে ও-আ আস্বম্ তা'লামুনা ।” আয়াত, ১৮৮।

† হুজুরাত :—“ও-আ ইন্ তাইফাতানে গিনাল্ মুমেনীনা ক্তাতালু ফা আস্লেহ্ বাইনা হুমা । ইন্নাগাল্ মুমেনুনা এখও-আতুন্ ফা আস্লেহ্ আখাওয়াইকুলু” । আয়াত, ৯,১০ ।

(ঘ) জকাত বা দীনদুঃখীর জন্য দান ।

ইসলাম ধর্মের চতুর্থ স্তম্ভ জকাত বা দীন-দুঃখীর হিতকল্পে ঈশ্বরোদ্দেশে দান । কোরান পুনঃপুনঃ মুসলেমকে জকাত-দানের উপদেশ করিতেছে । “সত্যপ্রকাশক কোরান গ্রন্থের এই সকল আয়াত । বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশ ও সুসম্বাদ, যাহারা উপাসনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখে, এবং জকাত দান করে, এবং পরলোকে বিশ্বাস করে,” নমূল (২৭)-১,২,৩.)। “ল্লাজীনা ইয়ুকিমুনাস্ সালাতা ও-আ ইয়ুতুনাজ্ জকাতা”—কোরানে ইত্যা-কার বাক্য জকাত বা দীনদুঃখীর জন্য দানকে পুনঃপুনঃ সালাত বা উপাসনার সহিত এক পর্যায়ে ভুক্ত করিয়াছে । “যাহারা কোরাণ-প্রাপ্ত তাহারা আর কিছুই জন্ম আদিষ্ট হয় নাই, ইহা বাতীত যে তাহারা ঈশ্বরের সেবা করে, সরল

বিবাদকারী কোন একদক্ষ যদি গায়মঙ্গত আপোষ অমান্য করে, তবে কি করতে হইবে ? কোরাণ সে প্রশ্নের উত্তর এই সূরা হুজুরাতেব নবম আয়াতেই দিতেছে :—“ফা ইন্ বাগাৎ এহ্দা হুমা আলান্ উখরা, ফা কাতেলু ল্লাহী তাবগী, ইত্তা তাফ-আ এলা আমারে ল্লাহে । ফা ইন্ ফা-আৎ, ফা আন্নেহু বাহিনা হুনা, বেগ্ আদলে, ও-আ আকসেতু । ইন্না ল্লাহা ইউইকুলু মুকসেতানা,”—“তৎপর ও যদি তাহাদের একজন অন্যজনের প্রতি অগ্নায় করে, তবে যে অগ্নায় করে, যে পর্যন্ত সে ঈশ্বরাজ্ঞার দিকে না ফিরে, সে পর্যন্ত তাহার সহিত সংগ্রাম করিও । পরে সে ফিবেলে, উভয়ের মধ্যে গায়মঙ্গতরূপে আপোষ করিও । নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাদিগকে ভালবাসেন, যাহারা নায় কাফা করে” । ৪৯-৯।

মনে ঠাহার অধীন হয়, অকপটচিত্ত হয়, এবং উপাসনাকে স্থির রাখে, এবং জকাত দান করে। ইহাষ্ট সতাদর্শ (৬-আ জালেকা দীনোল কাযিমাতে)” — বায়িনাত (৯৮)— ৫। পাঠক দেখিতেছেন, কেবলমাত্র ধনীকেই যে জকাত দান করিতে হইবে, কোরাণের মর্ম্ম সেরূপ নয়। মুস্লেম যে হইবে, সে ধনীই হউক, আর দরিদ্রই হউক, তাহাকে আপন আয় অনুসারে দুঃখীর হিতকল্পে অর্থ সাহায্য করিতেই হইবে ; নতুবা সে কোরাণের মতে মুস্লেম নয়, যদিও সে “কানা ছেলের পদ্মলোচন” নামের মত মুসলমান নাম ধারণ করিতে পারে। সূরা তালাকে (৬৫) কোরাণ স্পষ্ট বলিতেছে :-—“যাহার অনেক আছে, সে তাহা হইতে দান করিবে, যাহার উপজীবিকা সঙ্কীর্ণ, সেও পরমেশ্বর তাহাকে যাহা দিয়াছেন, তাহা হইতে ব্যয় করিবে। পরমেশ্বর কাহারো উপরে এমন বোঝা চাপান না, যাহা তিনি তাহাকে যে শক্তি দিয়াছেন, তাহার অতিরিক্ত। বস্তুতঃ কোরান উপাসনার সঙ্গ জকাত বা দানকে এই ভাবে পুনঃপুনঃ জড়িত করিতে, ইহাষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, যে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ যেমন উপাসনার সংজ্ঞা দিতেছেন—“তস্মিন্ প্রীতিস্তুম্ প্রিয়-কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনামেব”, কোরানও দেখা যায়, ঈশ্বারোপাসনার বহিরঙ্গরূপে জকাত বা দরিদ্রের হিতকল্পে দানের পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিতেছে। জকাত দান যে না করে, কোরান স্পষ্ট বলিতেছে, তাহার উপাসনা গৃহিত হয় না (সূরা মাউন দেখ)। উপাসনা বা সালাৎ ইসলাম ধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ, এবং

জাকাত বা দান ইসলাম ধর্মের শরীরস্বরূপ। জাকাত দানেই প্রকৃত উপাসনার বাস্তবপ্রকাশ। অপর দিকে হিন্দুধর্মের ও প্রধান স্তম্ভ দান, তিনটি ধর্মস্বাক্ষর মধ্যে একটি বলিয়া পরিগণিত, “ত্রয়ো ধর্মস্বাক্ষা যাজ্ঞাহ্বায়নং দানং” (ছান্দোগ্য, ২-২৩-১)। জাকাতের নামান্তর “সেদকা”। সেদকা দানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সূরা বরা’আতে (৯) কোরান বলিতেছে :— “নিশ্চয় এই দান (সাদাকাতে) দীনদুঃখীর জন্য, এবং নিরুপায়ের জন্য, এবং তাহাদের তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারীদের জন্য, এবং তাহাদের অন্তরকে সত্যের দিকে আকর্ষণ করা যাউতেছে, তাহাদের জন্য, এবং বন্দীর গ্রীবা মুক্তির জন্য (৬-আ ফীর্ বেকাবে), এবং ঋণগ্রস্তদের জন্য, এবং পরামেশ্বরের পথেয়র জন্য, এবং পথিকদিগের সাহায্যের জন্য। পরামেশ্বর হইতে এই আদেশ, এবং পরামেশ্বর সর্ববল সর্বশক্তিমান” (৬০)। সূরা মাইদাতে (৫) ও মুসলেমেয়র জন্য “বন্দীর ঘার মোচনের কর্তব্যতার উপদেশ আছে, “আউ তাহরীক্ রাকাবাতিন্” (৮৯)। আবার সূরা বালাদেও কোরান বলিতেছে, যে ইসলাম ধর্মের প্রধান অঙ্গ দাসের দাসত্ব-মোচন “ফাক্ রাকাবাতিন্” (৯০-১৩)—“দাসের ঘার বন্ধন মুক্ত করা,”—এবং এই উদ্দেশ্যে জাকাতের অর্থাৎ ব্যবহার করা বিধি। জাকাত যে ইসলাম ধর্মের মুখ্য অঙ্গ, বা প্রধান রোকন বা স্তম্ভ, তাহার পুনঃপুনঃ উল্লেখই তাহার প্রমাণ *।

* জাকাত ও পরোপকার সম্বন্ধে দেখ :—

বকারাহ (২)—আয়াত ৪৩, ৮৩, ১১০, ১৭৭, ১৯৫, ২০৭, ২১৫, ২৪৫, ২৬২,

এখন হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির প্রতি আমাদের জিজ্ঞাস্য হইতেছে, যে পৃথিবীর শক্তিশালী জাতি সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলে, কি বলিতে হয় না, যে বঙ্গীয় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে নারীজাতি অনেক পরিমাণে বন্দীর অবস্থায় আছে ? রাজ-নৈতিক সমান অধিকার * ত দূরের কথা ! আমাদের বঙ্গীয় নারীগণ মাত্রাজ কি বোম্বের মতন ও স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছামত পুরুষের ন্যায় হৃদয়মনের আলো লাভ এবং শরীরের স্বাস্থ্য-লাভ হইতে বঞ্চিত । কিছুদিন পূর্বে হিন্দুর মধ্যে সতীদাহ বা মৃত স্বামীর সঙ্গে তাহার জীবিত স্ত্রীকে অগ্নিসাৎ করার

২৬৭, ২৬৮, ২৭১, ২৭৩, ২৭৭ । ইমরান (৩) — ১৭২ । নিলা (৪) — ১১৪, ১৬২ ।
 নাইদাহ (৫) — ১২, ৫৫, ৮৯ । আন্ অম (৬) — ১৭০ হইতে ১৫৫ । আ
 রাকঃ (৭) — ৫৬ । আনফান (৮) — ৪১ । গাবা'আং (৯) — ১১, ১৮, ১০৩,
 ১০৪ । বনিইস্রাইল (১০) — ২৩ হইতে ৩০ । আন'বদা (১১) — ৭৩ ।
 হুজ্জ (২২) — ২৮, ৩৫, ৩৬, ৫১, ৭৮ । কুর (২৪) — ৩২, ১৬ । নমল (২৭) —
 ২, ৩, ৩৪, ৬০, ৭১, ৭২, ১০২ । রুমা (৩০) — ৫৮, ৫৯ । লুখমান (৩১) — ৩, ৪,
 ২২ হইতে ৩০ । আছজাব (৩৩) — ৫৩ । মুজাদিলাহ্ (৫৮) — ১২, ১৩ ।
 হালাব্ (৬৫) — ৭ । মা'আরুজ (৭০) — ১২ হইতে ২৫ । মুদাশির (৭৪)
 — ৪২ হইতে ৪৫ । উন্মান (৭৬) — ৭, ৮, ৯ । ফজর (৮৯) — ১০ হইতে
 ২০ । বালাদ (৯০) — ১১ হইতে ১৬ । লাইল (৯২) — ১৪ হইতে ১৮,
 এবং গাউন (১০৭) — ১ হইতে ৭ । ঋখেদে দারদের হিতকল্পে দান সম্বন্ধে
 আমাদের 'কোরানের সূরা, বেদের সূক্ত' (পৃঃ ৪১ হইতে ৪৩) দেখ ।

* আমাদের দেশে ও বিলাতের মত স্বরাজ বা দেশের অধিকাংশের
 মতে রাজ্যশাসনের (Democratic Constitution) সূত্রপাত হইয়াছে ।

প্রথা পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। হিন্দু নিজে বুঝিয়া শুনিয়া সেই নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করে নাট। আজও সেই অপরাধের জন্ত অনুতপ্ত হইয়া ঈশ্বরের নিকটে সে ক্ষমা ভিক্ষা করে নাট। হিন্দু বিধবা আজও পুনবিবাহ হইতে বঞ্চিত। আবার বহু-বিবাহ যে কেবল রাজানহারা রাজাদের মধ্যেই দৃষ্ট হয়, তাহা নয়। বিধবা-বিবাহের নামে একদল হিন্দু সংস্কারকও এখন বহুবিবাহ চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে ! বহু-বিবাহ বিষয়ে মুসলমানের ত কথাই নাট। পালন করিবার শক্তি থাকুক বা না থাকুক, এক স্ত্রী জীবিত থাকিতেই অনেক মুসলমান যত ইচ্ছা স্ত্রী গ্রহণ করে, এবং যখন যাহাকে ইচ্ছা পরিত্যাগ করে। হিন্দুর মধ্যে আবার স্ত্রী মরিলে, পুরুষ ইচ্ছামত অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু স্বামী মরিলে,

বিগত ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭ তারিখে, মৃতন দিল্লীতে, বড়লাট স্বয়ং অধোদ্যার তালুকদারদিগের জমিদারী প্রার্থনার উত্তরে বলিয়াছেন :—

“The present constitutional position is only a transitional stage in the relations of the executive towards the Legislature and people. Government could hardly therefore, even if it so desired, accept the responsibility of anticipating the final verdict of the electorate on so important a measure” (The Statesman, Feb 24, 1927).

বিদেশীয় গভর্নমেন্ট ও “স্বাধীনতা-সমতা-ভ্রাতৃত্ব” মূলক স্বরাজ আমাদের মুখে তুলিয়া দিতেছে ! তাহা সম্ভবই হউক আর অসম্ভবই হউক, আমরাও কি ইহার উত্তরে আমাদের মা-বোন-স্ত্রী-কন্যাদিগকে সকল বিষয়ে “স্বাধীনতা-সমতা-ভ্রাতৃত্ব” দান করিব না, তাহাদিগকে ও বিলাতের মত সমান অধিকার দিয়া, আমাদের স্বরাজ লাভের যোগ্যতা প্রমাণ করিব না ?

স্ত্রী ইচ্ছামত অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারে না। এ সকল পর্যালোচনা করিয়া, কে না বলিব, যে হিন্দু মুসলমান মধ্যে নারীগণ প্রকৃত মানবীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত, অন্ধ-বন্দীস্বরূপ। নারীজাতি মানব জাতির অঙ্গিক। অত্যাচার এবং পর-সেবার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া মাতারাই মানুষকে প্রকৃত মানুষ করে.—“The sex that civilises ours.” তাহাদের শরীর-মন-আত্মা স্বাধীন ভাবে বিকাশ লাভ করিতে না পারিলে, তাহারা পঙ্গু বা বিকলাঙ্গ হইলে, পৃথিবীর জীবন-সংগ্রামে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দিতায়, বঙ্গীয় হিন্দু-মুসলমান কিরূপে তাহাদের স্বস্থান রক্ষা করিবে? হিন্দু মাত্রেই জানা কর্তব্য যে বেদে দেখা যায়, নারীগণ এক দিকে ঋষি বা “নবি” ছিলেন, অপরদিকে যুদ্ধে সেনাপতির কাণ্ডা পর্য্যন্ত করিয়া যুদ্ধ জয় করিয়াছেন। নারীগণ যুদ্ধস্থলে উপস্থিত থাকিতেও ভীত হইতেন না। বড়বড় জনাকীর্ণ রাজসভায় উপস্থিত থাকিয়া, সে কালের হিন্দুনারীগণ স্বচ্ছামত সমান-ভাবে পুরুষ পণ্ডিতদের সহিত তত্ত্বালোচনা করিতেন। মুসলমানের ও জানা কর্তব্য যে মহম্মদের সময়ে দেখা যায়, নারীগণ যুদ্ধস্থলে উপস্থিত থাকিয়া সৈন্যদিগের সেবা করিতেন, এবং নসিরা নাম্নী বীর নারী * বিখ্যাত ওহদের যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ

* “কাবেব নসিরা নাম্নী এক বীর কণ্ঠা ছিলেন, তাঁহার বহু সদগুণ ও সিংহীর গায় সাহস বিক্রম ছিল। তিনি আপন স্বামী গরিয়া, এবং দুই পুত্র এমরা ও আবদোল্লাহর সহিত ওহদের যুদ্ধক্ষেত্রে আগমনপূর্বক পৌত্তলিক

করিয়া কোরেশ শত্রুদিগকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। একালেও দেখা যায়, এশ্যারাত মুসলমান নারীগণ এরাপ্লটন বা উড়ুকু জাহাজ চালাইতেছে। চিকিৎসাদি শাস্ত্রে সুপরিচিত সুবিখ্যাত রেডিয়াম ধাতুর আবিষ্কারী একজন মহিলা রাসায়নিক (Madame Curie)। আমাদের মা, ভগ্নী, স্ত্রী, এবং কন্যাদের ভিতরে কত শক্তি প্রচ্ছন্ন, কে বলিতে পারে? তাহা-দিগকে পুরুষের দাসত্ব বন্ধন হইতে মুক্ত করা ও কি কোরাণে “ফাক্ব বাক্বাবাতিন্” বলার উদ্দেশ্য নয়? হিন্দু-মুসলমান কি এই মহাব্রত সাধনে নিজ নিজ শরীরের শোণিত পর্য্যন্ত জ্বকাত বা দান করিয়া, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করিবে না? কোরাণ স্বয়ংই স্ত্রী-পুরুষের সমান কোবেশদিগের উচ্ছন্নসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নসিবা নিজমুখে বলিয়াছেন, আমি একটি মশক লইয়া ওহদেব বণস্থলে গিয়াছিলাম, তৃষিত মোসলমানদিগকে জলদান করিতেছিলাম। যখন দেখিলাম শত্রুকুল প্রবল হইয়া বিশ্বাসী দলের জীবন ও ধনসম্পত্তি হরণে হস্ত প্রদাবণ করিয়াছে, তখন জলদানে নিবৃত্ত হইয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই, সে বিষয়ে প্রাণপণে চেষ্টা পরিশ্রম করি। আমি তেরটি অস্ত্রঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তন্মধ্যে একটি আঘাতের ক্ষত একবৎসর পর্য্যন্ত ছিল। যখন আমি কমিয়াব পুত্র কর্তৃক আহত হই, তখন হজরত দেখিতে পাইয়া আমার পুত্র এমরাকে ডাকিয়া বলেন, “তুমি স্বীয় জননী নিকটে দৌড়িয়া যাও, তাহার ক্ষত স্থানসকল বন্ধন কর।” আমি সম্মানহয় সহ প্রেরিত পুরুষের সম্মুখভাগেই সংগ্রাম করিতেছিলাম। মোসলমান সহচরবর্গ পরাস্ত হইয়া হজরতের নিকট হইতে চলিয়া যাইতেছিল, আমার হস্তে ঢাল ছিল না, ইতিমধ্যে

অধিকার ঘোষণা করিতেছে :—“ও-আ লাহুমা মেসলু ল্লাজী আলাইহিমা বেল্ মা'ক্কাফে” (বকারাহ (২)-২২৮)—“এবং নারীগণের ন্যায়সঙ্গতরূপে তুলা অধিকার আছে, যাহা তাহাদের উপরে পুরুষদের আছে।” যদিও পুরুষের পশু-বলের কিঞ্চিৎ অধিকা হেতু কোরাণ সেই সঙ্গত বলিতেছে, “ও-আ লে রে'জাল আলাইহিমা দারাজাতুন্,” “পুরুষ নারী হইতে কিঞ্চিৎ উপরে,” তাহা বলিয়া কোরাণ এস্তলে স্ত্রীলোকের যে ন্যায়সঙ্গত সমান অধিকার (বেল্ মা'ক্কাফে) ঘোষণা করিতেছে, তাহা হইতে কেন তাহারা বঞ্চিত হইবে ? দ্রৌপদীর ন্যায়, মুসলমান নারীর যখন বহুবিবাহ করিবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার নাই, ইসলাম ধর্ম্মমতে পুরুষের ও সেরূপ ন্যায়সঙ্গত (বেল্ মা'ক্কাফে) অধিকার থাকিতে পারে না।

হজরত দেখিলেন যে, তাঁহার একজন সহচর ঢাল ধারণ করিয়া আছে। তিনি সেই ঢাল আমাকে দিবার জন্য তাহাব প্রতি অনুমতি কবিলেন, সে তৎক্ষণাৎ ঢাল হস্ত হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিল। হজরত আমাদের ষড়্ দেখিতেছিলেন, তখন তিনি আমার পুত্র আবদোল্লাকে ডাকিয়া বলিলেন, ‘তুমি শীঘ্র আপন মাতার নিকটে যাও।’ আবদোল্লা হজরতের আজ্ঞাক্রমে দৌড়িয়া আসিল। আমি পুত্রের সঙ্গে যোগ দিয়া উকু শক্রকে হত্যা করিলাম।” তখন হজরত ডাকিয়া বলিলেন, “আবদোল্লার মা, যে ব্যক্তি তোমার মস্তকে আঘাত করিয়াছে, এই দেখ সেই ব্যক্তি।” নসিবা বলিয়াছেন “আমি তখন সেই শত্রু সৈনিকের পদে আঘাত করিলাম, সেই আঘাতে সে পড়িয়া গেল, তাহা দেখিয়া হজরত হাসিয়া বলিলেন, ‘আপন প্রতিশোধ লইয়াছ।’ গিরীশ কৃষ্ণ জীবন পৃঃ ২৮১-৩।

সব পুরুষ ও শক্তিবিষয়ে সমান নয়। পুরুষের মধ্যে ও কেহ শক্তিতে উপরে, কেহ নীচে। কিন্তু পরস্পরের সম্বন্ধে ন্যায়সঙ্গত অধিকার বিষয়ে ("The Rights of Man") সকল পুরুষই সমান। আবার সে কালের আরবদেশীয়দের যুদ্ধই নিত্য ক্রিয়া ছিল। শারীরিক দুর্বলতা হেতু সে কালের, সে দেশের স্ত্রীলোককে জীবিকার জন্য এবং আত্মরক্ষার জন্য, অনেক সময়ে পুরুষের মুখাপেক্ষী হইতে হইত। তাঁই কোরাণ বলিতেছে :—

"আর .রজালা কাউবানুনা আলা মেসা-এ" ॥ নিসা (৪)—৩৪॥

"পুরুষ স্ত্রীলোকের প্রতিপালক"। তাহা বলিয়া কোরাণের মত নয়, যে নারীজাতি তাহাদের কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে (বেল্ মারুফ) বঞ্চিত হয়। এজন্যই "সকল ঈশ্বরবিশ্বাসী ভ্রাতৃত্বলা" (৪৯-১০) বলিয়া ও কোরাণ আরো স্পষ্টাক্ষরে স্ত্রীলোকবিশ্বাসীকে সর্ববিষয়ে পুরুষ বিশ্বাসীর সমান পর্যায়ে ভুক্ত করিয়া পুনঃপুনঃ বলিতেছে :— "যে ই সং কর্ম করে, স্ত্রী হটুক বা পুরুষ হটুক, এবং ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়, তাহারা স্বর্গোচ্চানে বাইবে, এবং তাহাদের প্রতি অনুমাত্রও অবিচার করা হইবে না।" নিসা (৪)—১২৪ ॥ আবার "নিশ্চয় ঈশ্বরে নির্ভরকারী পুরুষগণ এবং নির্ভরকারিণী নারীগণ, এবং বিশ্বাসী পুরুষগণ, এবং বিশ্বাসবতী নারীগণ, এবং ঈশ্বরানুগত পুরুষগণ এবং ঈশ্বরানুগত নারীগণ, এবং সত্যপরায়ণ পুরুষগণ, এবং সত্যপরায়ণা নারীগণ, এবং ধৈর্যশালী পুরুষগণ, এবং ধৈর্যশালিনী নারীগণ, এবং বিনীত পুরুষগণ এবং বিনীতা নারীগণ,

এবং দানশীল পুরুষগণ এবং দানশীলা নারীগণ, এবং উপবাসব্রত-
 ধারী পুরুষগণ, এবং উপবাসব্রতধারিণী নারীগণ, এবং সংযত-
 স্বভাব পুরুষগণ, এবং সংযতস্বভাবা নারীগণ, এবং ঈশ্বরের পুনঃপুনঃ
 স্মরণকারী পুরুষগণ, এবং স্মরণকারিণী নারীগণ, পরমেশ্বর
 তাহাদের জন্য ক্ষমা এবং প্রভূত পুরস্কার প্রস্তুত রাখিয়াছেন”
 (আহজাব (২৩)—৩৫)। আবার “যে ব্যক্তি সংকর্ষ করে,
 সে পুরুষই হউক আর স্ত্রীই হউক, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস করে,
 আমরা অবশ্য তাহাকে বিস্তৃত জীবনে জীবিত করিব, এবং
 নিশ্চয় তাহারা যেরূপ উৎকৃষ্ট কল্যাণ করে, তাহার অনুরূপ
 পুরস্কার তাহাদিগকে দিব।” সূরা নহল (১৬)—২৭।
 স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার সূচক কোরাণের এই সকল কথা
 পর্যালোচনা করিয়া, কি আমরা বুঝিব না, যে ইসলাম ধর্মের
 ইহাই মর্ম, যে স্ত্রীজাতি পুরুষ জাতির দাস হওয়া দূরে থাকুক,
 স্ত্রী-পুরুষের সকল বিষয়ে সমান অধিকার? আমাদের স্ত্রীজাতি
 যাহাতে তাহাদের বর্তমান আপেক্ষিক দাসীত্ব মুক্ত হইয়া, স্বাধীন
 ভাবে চিন্তা এবং স্বাধীনভাবে কার্য করিয়া, পৃথিবীর শক্তিশালী
 জাতিদের ন্যায় সর্ববিষয়ে পুরুষের সহিত সমান অধিকার লাভ
 করে, সেজন্য কোরাণের উপদেশ মত কি আমরা জকাতের * অর্থ

* জকাতে বা দরিদ্রের অন্নলাভের সাহায্য করা সম্বন্ধে বর্তমান কালে
 হিন্দু-মোসলমান উভরকেই কি উদারীন দেখা যায় না? কোরাণ বলিতেছে
 যে পরমেশ্বর-প্রদর্শিত শ্রেয়ের পথ বা “নজদাল্ খয়ের” অন্যথাকে এবং
 ধূল্যয় ধূসরিত দরিদ্রকে ক্ষুণ্ণার দিনে অন্নদান, “এং আমুন্ ফী ইয়াওমিন্

ব্যবহার করিব না, এবং প্রয়োজন হইলে শরীরের শোণিতপর্যাস্ত
 জকাত করিব না ? স্ত্রী-পুরুষ উভয় শ্রেণীর বিশ্বাসীর জন্য
 কোরাণ বলিতেছে :—“ও-আ লা তাক্ফু মা লাইসা লাকা বেহি
 এল্-মূন্” (বনি ইস্রাইল (১৭)—৩৬) “যে বিষয় সম্বন্ধে তোমাদের
 জ্ঞান নাই তোমরা তাহার অনুসরণ করিও না” । এরূপ
 অবস্থায় আমরা কি মনুর সঙ্গ সুর মিলাইয়া আজও বলিব,
 “ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মহতি” (৯-৩), না আমরা কোরাণের সঙ্গ সুর
 মিলাইয়া বলিব “ও-আল্ মোমেনুনা ও আল্ মোমেনাতো
 বা’জু হুমু আউলিয়াসু বা’জিন্,” “এবং বিশ্বাসী পুরুষ এবং
 বিশ্বাসী নারীসম্বন্ধে বলা যাইতেছে, যে তাহারা পরস্পরের
 অভিভাবক” । অথচ ইসলামের শত্রুরা প্রচার করিয়া থাকে,
 যে কোরাণ মতে নারীজাতির আত্মা নাই ! কি আশ্চর্য্য,
 কোরাণের মতে পুরুষ যেমন স্ত্রীলোকের অভিভাবক, স্ত্রীলোকও

স্ত্রী গাম্গাবান্—সূবা বালাদ (৯০)—১০.১৪ হইতে ১৬ আয়াত দেখ ।
 কিন্তু মুসলমানেরা কি সে বিষয়ে এখন উদাসীন নয় ? আবার বেদ
 বলিতেছে, অদাতাকে স্ত্রী করিবার কেহ থাকে না, “উতাপূগন্ মডিভারং
 ন বিন্দতে,” “যে কেবল আপন আহার লইয়া বাস্তু, সে কেবল পাপ সঞ্চয়
 করে,” “কেবলাঘো ভবতি কেবলাদৌ” (ঋগ্বেদ ১০-১১৭-১,৬.) । কিন্তু
 আজকাল হিন্দু-মুসলমানের মনো গরিবের অন্নবস্ত্রের কথা ভাবে, এমন লোক
 অতি বিরল । পৃথিবীর অন্যান্য দেশ কোথায়, আর আমরা কোথায় ! বিলাতে
 জনপ্রতি দৈনিক আয় গড়ে ৬।০ পাউন্ডে ছয় টাকা, আমেরিকাতে গড়ে ১৪।০
 পাউন্ডে চৌদ্দ টাকা, জাপানে জনপ্রতি দৈনিক আয় গড়ে ৪।০ চার টাকা

সেইরূপ পুরুষের অভিভাবক ! কবে আমরা নারীজাতির প্রতি সমতার চক্ষুদৃষ্টি করিব,—এবং তাহাদিগকে সকল বিষয়ে পুরুষের সহিত সমান অধিকার প্রদান করিব ।

হজরতের ব্যক্তিগত মত ও জীবন সম্বন্ধে একথাও সকলেরই জানা কর্তব্য, যে হজরত মহম্মদ পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রমে খদিজা বিবিকে বিবাহ করেন, এবং তখন খদিজার বয়স চল্লিশ বৎসর । এই হজরতের প্রথম বিবাহ । যত দিন খদিজা বিবি জীবিত ছিলেন, তত দিন মহম্মদ অন্য স্ত্রী গ্রহণ করেন নাই । পয়ষটি বৎসর বয়ঃক্রমে খদিজার মৃত্যু হয় । হজরত মহম্মদ এই পঁচিশ বৎসর কাল দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করেন নাই । ইহাতে ও কি প্রমাণ হয় না, যে মহম্মদের মতে এক স্ত্রী গ্রহণই পুরুষের পাক্ষ বিধি । খদিজার মৃত্যুর পর,

এগার আনা, আর ভাবতবাসীর জনপ্রতি দৈনিক আয় গড়ে ১০ ছয় পয়সা মাত্র । ইহার ফলে বিলাতে লোকের আয় গড়ে ৫০ বৎসর, আমেরিকায় ৫৬ বৎসর, জাপানে ৪৭ বৎসর, এবং ভারতবাসীর আয় গড়ে মাত্র ২২ বৎসর । দেশের জনসংখ্যারও এই সামাজিক তুর্গাতন প্রতি হিন্দু ধনিকেরও দৃষ্টি নাই, মুসলমান ধনিকেরও দৃষ্টি নাই । বিগত ১৪ই ডিসেম্বর ১৯২৬, বিদেশ হইতে সমাগত ভারতের বর্তমান বড় লাট রায়হ-জামদারের পরস্পরের প্রতি কর্তব্য এবং দাবি (Rights and Duties) বিষয়ে বাঙ্গলার জমিদারদিগকে বলিয়াছেন :— "All good landlords know that their tenants are really in the nature of a trust, and that the obligations are more on the side of

হজরত, সে দেশের, সে কালের প্রচলিত আচার মত, ছয় বৎসরের বালিকা কুমারী আয়েশাকে বিবাহ করেন, এবং ছয় বৎসরের শিশুদ্বারা সংসার চলিতে পারে না দেখিয়া, সেই সঙ্গে তাহার এক সহচরের বিধবা পত্নী সুদাকেও বিবাহ করেন। বদর, ওহদ ইত্যাদি যুদ্ধে হজরতের অনেক গৃহতাড়িত সহচর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেই আপদ-সঙ্কুল সময়ে নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের বিধবা স্ত্রীদিগকে স্বীয় গৃহে আশ্রয় দেওয়া হজরতের কর্তব্য হইয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে একত্রে বাসকে, সে কালের সে দেশের আচার মত, বৈধ করিবার জন্য, পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রমের পর, রুদ্ধ হজরত তাহাদিগকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহাও সকলের জানা কর্তব্য, যে খদিজার মৃত্যুর পর, আয়েশা ভিন্ন অন্য কোন কুমারীকে হজরত মহম্মদ স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন নাই। এই সকল কথা সকলেরই পর্যালোচনা করা কর্তব্য। মুসলমান ভাইগণ,

the landlord than on that of the tenant. A tenant's duty is done when he has paid his rent. A landlord's duty is not discharged until he has seen to it that his tenants have adequate housing, decent conditions of life, and the opportunities for education which will fit them to be useful members of the village and of the State." (The Bengalee.)। গরীব রায়তাদি সাধারণের পক্ষে ইহা কত বড় আশার কথা! কিন্তু হায়, আমাদের দেশের নেতাগণ, পাছে রায়তাদি জনসাধারণ উপযুক্ত বাসগৃহ, উদ্বোধিত জীবিকা, এবং উপযুক্ত সুশিক্ষার দাবি

কোরাণ যে বলিতেছে,—“যদি তোমরা ভয় কর, অনাথদিগের প্রতি ন্যায়সঙ্গতরূপে ব্যবহার করিতে পারিবে না, তবে এমন স্ত্রীলোক সকলকে বিবাহ কর, যাহাদিগকে তোমরা ভাল মনে কর, দুইটি, কি তিনটি, কি চারিটি ; কিন্তু যদি আশঙ্কা কর, যে তুমি তাহাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করিতে পারিবে না, তবে একটি মাত্র বিবাহ কর, অথবা তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাকে অধিকার করিয়াছে, তাহাকে বিবাহ কর । ইহাই অধিকতর শ্রেয়ঃ, যেন তোমরা কর্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট না হও,” সূরা নিসা (৪)-৩,—হজরতের নিজের, খদিজার সহিত বিবাহিত জীবনের ২৫ পঁচিশ বৎসরের এই দৃষ্টান্ত দৃষ্টে তোমরা এই আয়াতের মর্ম গ্রহণ কর । যুদ্ধাদি দ্বারা বহু পুরুষ নিহত হইয়া, বহুনারী বিধবা হইলে, যেমন ৬-তদের যুদ্ধে হইয়াছিল, বা বর্তমানে জর্মানি সম্বন্ধেও যেমন শোনা যায়, বহু-বিবাহ কিছুদিনের জন্য (as an Emergency Measure) বৈধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে কিনা, তখন বিচার করিও ।

জমিদারের উপরে করে, সে ভয়ে দেশের ধনিক জমিদার, মহাজন, এবং তাহাদের পৃষ্ঠপোষিত উকিলাদি, নেতাগণ সে বিষয়ে চেষ্টা করাত ছরের কথা ! কেহই সে আশার কথা জনসাধারণের কর্ণগোচরও করাইতেছেন না ! ভারত সম্রাট্ ১৯২১ সনে তাঁহার দূতবার্ত্তা দ্বারা (Royal Message of 1921) ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধিদিগকে তাহাদের কর্তব্য নির্দেশ করিয়া জানাইয়াছিলেন :-“On you it also lies to remember the many millions of your fellow-countrymen who are not yet

(ঙ) হজ্ বা মক্কা তীর্থ দর্শন ।

ইসলাম ধর্মের পঞ্চম স্তম্ভ মক্কা তীর্থ দর্শন বা হজ্ । কোরাণ বলিতেছে :—“মানুষের নিকটে হজ্ যাত্রার মহিমা ঘোষণা কর”—সূরা হজ্ (২২)—২৭ । “ঈশ্বরের উদ্দেশে হজ্ ক্রিয়া সম্পন্ন কর. এবং তৎসংক্রান্ত ব্রত পালন কর,” বকরাহ (২) - ১৯৬ । “ঈশ্বরের নামে, যে কেহ তাহা করিতে সমর্থ, ঈশ্বরের মন্দিরে যাত্রা মানুষের অবশ্য কর্তব্য,” সূরা উম্‌রান্ (৩)—৯৬ । আবার “একমাত্র সে ব্যক্তিই ঈশ্বরের মন্দির সকল দর্শন করিবে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরে, এবং শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস করে, উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে, দরিদ্রের হিতকল্পে ঈশ্বরোদ্দেশে দান করে, এবং ঈশ্বর ভিন্ন কাহাকেও ভয় করে না. সম্ভবতঃ তাহারা প্রকৃত পথের যাত্রী মধ্যে গৃহীত হইবে,” সূরা বরা'আৎ বা তওবা (৯-১৮) । তীর্থ দর্শনে শরীর মন পবিত্র হয়, ইহা সকলেরই অনুভূতি সিদ্ধ । মক্কা তীর্থ

qualified for a share in political life. to work for their upliftment, and to cherish their interests as your own” । হায়, আমরা দিগকে কি শয়তানে পার নাই ? হিন্দু-মুসলমান নেতীগণ, সে দিকে দৃকপাত না করিয়া, একে অণ্ডের মাথা ফাটাইতেই বাস্ত ! দরিদ্র কৃষকশ্রমিকদিগকে জকাত বা ঈশ্বরোদ্দেশে শরীরের রক্ত পর্য্যন্ত দান করিয়া তাহাদের অন্ন এবং আয়ুর্দ্ধির সাহায্য করা বিষয়ে, (“to help them to help themselves”) সকলেই বিমুখ !

সম্বন্ধে আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য, যে হজরত মহম্মদের জন্মের প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্বে একেশ্বরবাদিদিগের অগ্রণী হজরত এব্রাহিম এবং তাহার পুত্র মহাত্মা ইসমাইলদ্বারা এই তীর্থ, এবং জম্জম্ কূপ, এবং কাবা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গিরিশ মৌলবী তাহার রচিত মহম্মদের জীবন চরিতে বলিতেছেন :—“এব্রাহিম মাসাহু একবার অশ্বারোহণে কেনান হইতে মক্কায় আসিয়া (তাহার স্ত্রী) হাজেরা ও(পুত্র) এস্মায়িলের সংবাদ লইয়া যাঠিতেন। ইতিমধ্যে তিনি একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত তথায় এক মন্দির স্থাপন করেন। এব্রাহিম সয়ং স্থপতি হইয়া, এস্মায়িলের সাহায্যে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন ও প্রাচীরাদি নির্মাণ করিয়াছিলেন। এব্রাহিমের প্রতিষ্ঠিত সেই মন্দিরই বর্তমান কাবা মন্দির। কাবা পাষণ-নির্মিত। এব্রাহিম সময়ে সময়ে সস্ত্রীক স্বদেশ হইতে আসিয়া এই কাবা মন্দিরে উপাসনাদি করিয়াছেন। ইহার এক্ষণ পূর্বেবর অবস্থা নাই, পুনঃ পুনঃ জীর্ণ সংস্কার করিতে হইয়াছে। এব্রাহিমের সময় হইতেই এই মন্দিরের মহামাহাত্ম্য ও গৌরব। এখনও নানা-দেশের লক্ষ লক্ষ যাত্রিক আসিয়া এই মন্দির দর্শন ও প্রদক্ষিণাদি করিয়া থাকে। এব্রাহিম হইতেই মক্কা এইরূপে মহাতীর্থে পরিণত হয়। কালক্রমে প্রতিমার বিনাশকারী একেশ্বরবাদের প্রবর্তক, এব্রাহিমের এই মন্দিরে বিবিধ প্রতিমা স্থাপিত হইয়া পূজিত হয়। বহুকাল নানা দূরদেশ হইতে

যাত্রিকগণ এখানে প্রতিমাদর্শন ও অর্চনা করিতে আইসে। কাবামন্দিরের একপাশে একখণ্ড প্রস্তরের উপরে এত্রাহিমের পদচিহ্ন আছে, তাহাকে লোকে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকে”। (পৃঃ ৫।) কোরেইশ বংশ এই কাবামন্দিরের রক্ষক ছিলেন, এবং তাহাদের সম্মতি মতে হজরত মহম্মদের পিতামহ আবদুল মোতালেব জমুজমু কুপের অধিকারী হইয়াছিলেন। কাবামন্দির সম্বন্ধে কোরাণেও বলিতেছে :—৬-আ এজ্ জা-আল্ না ইত্যাদি। “এবং (স্মরণ কর সেই দিন) যখন আমি এই কাবামন্দিরকে মানুষের গম্ভব্য স্থান এবং নিরাপদে বাসের স্থান কারলাম। ইত্রাহিমের দাঁড়াইবার স্থানকে (মাকামে ইব্রাহিমা) তোমাদের উপাসনার স্থান কর। ইত্রাহিম, এবং ইসমাইলকে আমি এই বলিয়া আদেশ করিয়াছিলাম, যে তোমরা যাত্রীদের জগু আমার গৃহকে পবিত্র কর, যাহারা এখানে আসে, যাহারা উপাসনার উদ্দেশ্যে এখানে থাকে, যাহারা নমস্কার করে, এবং প্রণিপাত করে, বকারাহ্(২)—১২৫। এই আয়াতে উক্ত “মাকামে-ইত্রাহিমা” বা ইত্রাহিমের দাঁড়াইবার স্থান সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন, যে কাবা নির্মাণ সময়ে ইত্রাহিম যে প্রস্তরখণ্ডের উপরে দাঁড়াইতেন, ইহা সেই প্রস্তরখণ্ডেরই নাম। সেজন্যই এই প্রস্তরখণ্ডের এত সম্মান, যে যাত্রীগণ এই প্রস্তরখণ্ডকে চুম্বন করেন ; এবং মুসলমানগণ যেখানেই থাকেন, সেই কাবামন্দিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া উপাসনা করেন। কোরাণেরও তাহাই উপদেশ :—“তুমি যেখানেই থাক, সেই

মস্জিদে ল্ হারাম বা পবিত্র মস্জিদে দর দিকে মুখ ফিরাও” বকরাহ্ (২)—১৪৪ ।

যাহারা ঠিকভাবে হজ্জ্ ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের পক্ষে এই হজ্জ্ ব্রত যে কিরূপ পুণ্যব্রত, নিম্ন প্রদর্শিত কোরাণের কতিপয় আয়াত হইতে, হিন্দুই হউন আর মুসলিমই হউন, পাতক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন :—(১) “নির্কোষ লোকেরা বলিব, তাহারা কেন তাহাদের পূর্ব ‘কেবলা’ * পরিবর্তন করিল ? বল, পূর্ব এবং পশ্চিম সকলই একমাত্র পরমেশ্বরের । তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, সরল পথ দেখাইয়া দেন,”—বকরাহ্ (২) —১৪২ । “তুমি তোমার মুখ পূর্ব দিকেই ফিরাও, কি পশ্চিম দিকেই ফিরাও, ইহাতে কোন পুণ্য নাই, তবে পুণ্য ইহাতে যে তোমরা ঈশ্বরে, এবং পরকালে, এবং ফিরিস্তাগণে, এবং ধর্মগ্রন্থে, এবং প্রেরিত গণে বিশ্বাস কর, এবং ঈশ্বর-প্রীতির নিদর্শন স্বরূপে আত্মীয়দিগকে, অনাথদিগকে, অভাব-গ্রস্তদিগকে, পথিকদিগকে, ভিক্ষুকদিগকে, এবং দাসত্বমোচনার্থ, ধন দান কর, এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, এবং ক্বকাত দান কর ।” বকরাহ্ (২)—১৬৭ ।

(৩) “হজ্জের মাসসকল নির্দ্ধারিত আছে । যে ই সেই সেই মাসে হজ্জ্ করিতে সঙ্কল্প করে, সে হজ্জের কালে স্ত্রীসহবাস করিবে না, কুকার্য করিবে না, এবং বিবাদ করিবে না ; এবং তোমরা যে সংকল্প কর, পরমেশ্বর তাহা জানেন । বকরাহ্ (২)—১৯৭

* যে দিকে মুখ করিয়া উপাসনা করিতে হয় ।

(৪) “হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা যখন হাজের যাত্রিক হইয়াছ, তখন মুগয়া করিয়া পশুবধ করিও না” (৫)—২৫ ।

(৫) “এবং বলির উট সম্বন্ধে আমি তোমাদের জন্য ইহাকে ঈশ্বরভক্তির চিহ্নরূপ করিয়াছি । তোমাদের জন্য তাহার মধো বিশেষ কল্যান আছে । অতএব যখন (বলিদান জন্য) সে গুলি শারিবাঙ্কিয়া দাডায়, তখন তাহাদের উপরে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ কর, এবং যখন তাহারা পতিত হয়, তাহা ভক্ষণ কর, এবং প্রার্থী ও অপ্রার্থী দরিদ্রকে তাহা খাওয়াও । তাহার মাংস অথবা রক্ত পরমেশ্বরের নিকটে যায় না, কিন্তু তিনি তোমাদের ধর্মভীরুতাকে আদর করেন” । সূরা হজ্ (২২) —৩৬.৩৭) । *

হজ্ ব্রত বা মক্কাতীর্থ দর্শনকে হিন্দু অবশ্য সম্মানের চক্ষে দেখিবেন । বস্তুতঃ একালের হিন্দুর মধো পুণ্য সঞ্চয়ার্থ তীর্থ দর্শনের শ্রাদ্ধ এত দূর গড়াইয়াছে, যে তাহারা কুম্ভমেলাদি অনেক তীর্থকে কশাইখানা হইতেও অধম, মানুষের বধাত্মমিত পরিণত করিতেও কুণ্ঠিত নহেন । যাহা হউক, ঋগ্বেদেও আমরা

* যাহারা হজ্ সম্বন্ধে অধিক জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা কোরাণের নিম্নলিখিত সূরা ও আয়াত সকল দেখিবেন :—বকরাহ (২)—১২৫ হইতে ১২৭, ১৪২ হইতে ১৪৮, ১৫৮, ১৭৭, ১৯৬ হইতে ১৯৮ । ইমরান (৩)—২৬, ২৭ । গাইদাহ (৪)—২৫, ২৬ । বরা'আং বা তওবা (২)—১৮, ২৮ । ইয়ুসুস (১০)—৮৭ । হজ্ (২২)—২৬ হইতে ২৯, ৩৪ হইতে ৩৭ ।

তীর্থের প্রভাব দেখিতে পাউ। হিন্দু-মুসলমানের উভয়েরই জ্ঞানা উচিত, যে কোরাণ বলিতেছে :—“ও-আ লাকাদ্ বা-আস্না ফী কুলে উম্মাতিন্ রাসুলান্ আনে’ বুদু ল্লাহা ও-আজ্-তানেবু স্তাওতা” ॥ নহল (১৬)—৩৬। “এবং নিশ্চয় সকল জাতি মধ্যেই আমি রসুল বা ঋষি পাঠাইয়াছি, এই বলিবার জন্য যে তোমরা পরমেশ্বরের সেবা কর, এবং পাপ-দেবতার পূজা পরিত্যাগ কর।” এবং “ও-আ রসুলান্ কাদ্ কাসাস্নাহম্ আলাইকা মিন্ কাবলু ও-আ রসুলান্ লাম নাক্-সুস্হম্ আলাইকা,” নিসা (৫)—১৬৪ ॥ “এবং প্রেরিতগণ যাহাদের নাম পূর্বে তোমার নিকটে উল্লেখ করিয়াছি, এবং প্রেরিতগণ যাহাদের নাম তোমার নিকটে উল্লেখ করি নাই (পাঠাইয়াছি)।” আবার “লা নু ফারেরকু বাইনা আহাদিন্ স্মিন্ রসুলেহি,” বকরাহ্ (২)—১৮৫, ১৩৬, “তাহার কোন রসুল বা প্রেরিতের মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য করিনা।” কোন প্রকৃত মুসলমানের পক্ষে কি সেরূপ পার্থক্য করা তবে কর্তব্য ? বৈদিক যুগের রসুলগণকেও তবে মুসলমান কেন স্বীকার করিবে না ?

অথেষ্টে আমরা দেখিতে পাই, দধীচি একজন আদিম বৈদিক যুগের রসুল বা প্রেরিত নবি বা ঋষি। তিনি একদিকে মহাজ্ঞানী, মধুবিজ্ঞার উপদেষ্টা, “দধ্যাঙ্ হ যশ্বধ্বাথর্বণো বামশ্বশ্চ শীষ্যা প্র যদীমুবাচ” ॥১—১১৬-১২ “অথর্ব্বার পুত্র দধ্যাঙ্ নামক ঋষি তদীয় ‘অশ্ব’ বা সর্বব্যাপী ঈশ্বরে আত্মহারা (‘অশ্ব’ব্যাপ্তো)

শিবের তোমাদিগকে এই মধু বা মধুবিজ্যা যখন উপদেশ করিয়াছিলেন”। অবশ্য এটি সঙ্গে, ইন্দ্রাদি অন্য বৈদিক দেবতা সম্বন্ধে যেকোনো, সেই অশ্বিন্ সম্বন্ধেও বৈদিক অশ্বিন্‌দেব বা দিব্য-রাত্রি-বিষয়ক উপকথা সকল জড়িত। (আমাদের ঋগ্বেদ (১), পৃঃ ১০৪-৭ দ্রষ্টব্য)। এস্থলে তাহার উল্লেখ করা গেল না। বৈদিক মধুবিজ্যা কি ? যে বিজ্যালাভে সর্বত্র পরমেশ্বরের প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া, বিশ্বসংসারকে মধুময় দেখা যায়, সেই বিজ্যাই নাম মধুবিজ্যা (বৃহদারণ্যক, ১-৫-১ হইতে ১৯ দেখ)। উপনিষৎ সাংক্ষা দিতেছে, যে দধীচির উপদিষ্টে এই মধুবিজ্যা লাভ করিয়াই ঋষি গর্গ ভারদ্বাজ বলিয়াছিলেন :- “রূপং রূপং প্রতিক্রমো বভূব তদস্ম্য রূপং প্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পরুরূপ ঙ্গয়তে যুক্তা হস্ম্য হরয়ঃ শতাদশ” (বৃ. ১-৫-১৯, এবং ঋগ্বেদ, ৬-৪৭-১৮)। “যেখানে যে কোন বস্তুর রূপ আছে, ইন্দ্র বা অন্নদাতা পরমেশ্বর তাহারই প্রতিফলিত হইয়াছেন, যেন তিনি সেই সেই রূপ প্রত্যক্ষ দর্শন করেন (objective realization)। ইন্দ্র আপন সৃষ্টিশক্তি বা ভাঙ্গাগড়ার শক্তিপ্রভাবে (মায়াভিঃ— “মাতি চ যাতি চ”) নানারূপের ভিতর দিয়া গমন করেন। তাহার অনন্ত (শতা দশ) রূপ গ্রহণশক্তি সকল (হরয়ঃ) সেই কার্যে নিযুক্ত আছে।” উপনিষদে এই মন্ত্রটির আকার ঋগ্বেদ হইতে যৎকিঞ্চিৎ ভিন্ন।

আবার দধীচি মহাবীর ছিলেন। দেবগণকে বৈদিককালের ‘মুসলিম’ বলিতে হয়, এবং অসুরগণকে সে কালের ‘কাফের’

বলিতে হয়। সময়ে সময়ে এ উভয়ের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হইত। দধীচি যতদিন জীবিত ছিলেন, তাহার বীরত্বের প্রভাব, অসুর বা বৈদিক কাফেরেরা মাথা উঠাতে পারে নাট। তাহার মৃত্যুর পর, রত্ননামক সেনাপতিদ্বারা চালিত অসুরগণ এত প্রবল হইল, যে তাহাদের সহিত যুদ্ধে দেবসৈন্যদল অস্থির হইয়া পড়িল। তখন দধীচির স্থলবর্তী ইন্দ্র-নামক দেব-সেনাপতি অনেক অনুসন্ধানের পর, ককাক্ষত্র শর্মাণাবৎ নামক সরাবরে দধীচির অস্থিসকল পাঠলেন। দেবসৈন্যগণ যখন দধীচির সেই সকল অস্থি দেখিলেন, -- “England expects every man to do his duty,” নেলসনের এই বাণী যেমন ট্রেফল-গারের নৌ-যুদ্ধে ইংরাজ সৈন্যদলকে মহা সাহসে উত্তেজিত করিয়া বিজয়ের কারণ হইয়াছিল, - দধীচির অস্থি দর্শনও সেইরূপ, দেবসৈন্যদলকে, দধীচির সময়ের দেবগণের গৌরবের স্মৃতি জাগাইয়া দিয়া, দেবগণকে বীর ভাবে এত উত্তেজিত করিল, যে রত্নচালিত অসুর সৈন্য সে তেজ সহ্য করতে পারিল না। রত্ন হত হইল, দেবগণ বিজয়ী হইলেন। অবশ্য পাঠক ভুলিবেন না, যে বেদমন্ত্রগুলির স্থলবিশেষে তিনপ্রকার অর্থ :- (১) ঐতিহাসিক, (২) ভৌতিক বা জগৎব্যাপার-সম্বন্ধী, এবং (৩) ঐশ্বরিক।

“ইন্দ্রো দধীচো অস্থিভিব্ ব্রাণ্যপ্রতিস্কৃতঃ। জঘান নবতীর্ণব ॥
ইচ্ছন্নশস্য যচ্ছিরঃ পর্বতেষপশ্রিতং। তন্নিদচ্ছর্গণাবতি” ॥ ঋগ্বেদ
১-৮৪—১৩, ১৪ ॥ . “ইন্দ্র দধীচির অস্থিদ্বারা রত্নের অসুরদলকে
আটশত দশবার (৯০ X ৯) পরাস্ত করিলেন, তাহারা সে বেগ

কোনদিকেই সহ্য করিতে পারিল না (অপ্রতিক্ষুতঃ)। সর্বব্যাপী ঈশ্বরের জ্ঞানে জ্ঞানী দধীচির সেই মস্তক (অশ্বশ্য শিরঃ) যাহা পর্বতে ছিল, ঈশ্বর অনুসন্ধান করিয়া, তাহা শর্বাণাবৎ প্রদেশে পাঠিয়াছিলেন। সেই অবধি কুরুক্ষেত্রের শর্বাণা সরোবর বৈদিক কালের একটি মহাতীর্থ পরিণত হইয়াছিল, এবং ঋষিগণ তথায় মহা আড়ম্বরের সহিত তাহাদের যজ্ঞ বা সাক্ষাতিক ঈশ্বরোপাসনার (Symbolical worship) অনুষ্ঠান করিতেন। তাই বৈদিক ঋষি বলিতেছেন :—“মন্দস্বা স্তু স্বর্গর, উত্তম শর্বাণাবতি। মৎস্বা বিবস্বতা মতী” ॥৮-৬-৩৯ ॥ “ই ইন্দ্র, শর্বাণা নামক সরোবর (শর্বাণাবতি) যেখানে, যেখানে সকল ঋষিগণ মিলিয়া যজ্ঞ করেন (স্বর্গর), সেখানে তুমি বিশেষ আনন্দলাভ কর (মন্দস্ব)। তথায় যজ্ঞকারীদিগের (বিবস্বতঃ) স্তুতি-বন্দনা শুনিয়া (মতী) আনন্দিত হও”। “স্বাষাঃ শর্বাণাবতাজীক পাস্ত্যাবতি। যযুর্নিচক্রয়া নরঃ” ॥ ৮-৭-২৯ ॥ “উত্তম সোমযুক্ত ঋজীকদেশ (কুরুক্ষেত্র) যেখানে যজ্ঞগৃহ-শোভিত শর্বাণা সরোবর, নেতা ঋষিগণ (নরঃ) নিম্নমুখী চক্রযুক্ত শকটে তথায় গমন করেন।” তীর্থ সম্বন্ধে পাঠক এস্থলে অবশ্য দেখিতেছেন, ঈশ্বর যেমন এক, মানব প্রকৃতি যেমন এক, সত্য যেমন এক, তীর্থবিষয়ক মূলতত্ত্ব ৬ এক। সে সম্বন্ধেও প্রকৃত হিন্দুধর্ম এবং প্রকৃত ইসলাম ধর্ম এক, প্রকৃত হিন্দু এবং প্রকৃত মুসলেম এক।

আলাহ্ ।

বস্তুতঃ ইসলাম ধর্মের একমাত্র স্তম্ভ আলাহ্ । একমাত্র পরমেশ্বরে এবং পরকালে ঈমান বা বিশ্বাস, এবং মংকস্মের অনুষ্ঠানেই ইসলামের ভিত্তি । “যে কেহ ঈশ্বরে এবং পরকালে বা বিচারের দিনে বিশ্বাস করে, এবং মংকস্ম করে, তাহারা পরমেশ্বরে হইতে তাহাদের পুরস্কার পাইবে, তাহাদের জন্য কোন ভয় নাই, তাহাদের কোন দুঃখ থাকিবে না” (বকরাত্ (১)- ৬১) । কোরাণ প্রদর্শিত সেই ঈমান বা বিশ্বাস মূল বিশ্বাস নয়, জীবন্ত বিশ্বাস, যে বিশ্বাসের বলে মানুষ ঈশ্বরে ভিন্ন কাহাকেও ভয় করেনা (“ইয়াংয়া ফাতুকুনে ১-৪১), যে বিশ্বাসের বলে অল্পসংখ্যক লোক, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে, বহুসংখ্যক লোককে যুদ্ধে জয় করিতে পারে (১-১৪৯), যে বিশ্বাস লাভ করিলে, ঈশ্বরে ভিন্ন অন্য কাহাকেও মানুষ প্রভু বা গুরু বলিয়া মনে করিতে পারে না (৩-৬৩) - “ ৬-আলা ইয়াতাতাজা বা’জুনা বাজান্ আব’বাবান্ মিন্‌দুনে শ্লাহে ” : যে বিশ্বাসের বলে ঈশ্বর-বিশ্বাসীরা পরস্পরে ভাই, “ইম্মানাল্ মুমেন্বুনা এখওয়াতুন্” (হুজরাত (৪৯) ১০ “Freedom, fraternity, equality” follow as a necessary corollary) ; যে বিশ্বাস অন্ধ বিশ্বাস নয়, যেহেতু প্রকৃত মুসলিমকে বাহা করিতে হয়, বুঝিয়া স্বজিয়া করিতে হইবে, কারণ কোরাণ বলিতেছে : —“যে বিষয় সম্পর্কে তোমার নিজের কোন জ্ঞান নাই, তাহার অনুসরণ

করিও না : নিশ্চয় কণ, চক্ষু এবং হৃদয়, তাহাদের সংকলকেই সে
 সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইবে,”— “ও-আলা তাক্ফু মা লাইসা লাকা
 .বতি এল্-মুন্ । ইন্নাস্-সাম্-আ ও-আল্-বাসারা ও-আল্-ফু-আ
 দাকুল্লু উলা-একা কানা আন্থো মাস্-উ-লান্” ॥ বনিইস্রাইল
 (১৭) -- ৩৬। কোরাণ বার বার বলিতেছে :— “লা-আল্লাকুম্
 ত্র'কিলুনা” (৪৩-৩). “যেন তোমরা বুঝিতে পার :” যে কোরাণ
 বুঝে না, সে তবে কমন মুসলমান ? কাণা ছেলের নাম পদ্ম-
 লোচন যমন । কোরাণ বলিতেছে, “যে কেহ ইহলোকে অন্ধ, সে
 পরলোকে ও অন্ধ হইবে, এবং সত্যপথ হইতে আরো দূরে
 পড়িবে” ১৭-৭১ । বস্তুতঃ ইসলাম ধর্ম চক্ষুস্থানেরই জন্ম—
 “ফা'তাবেকু ইয়া টিলিল্ আবসারে” (হাশ্-র. ৫৯-২). অন্ধ-
 বিশ্বাসীর জন্ম ইসলাম ধর্ম নয় । যে বিশ্বাস বা ইমান মানুষকে
 অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যায়, ইসলাম সেই বিশ্বাসীর
 জন্ম, কারণ .কোরাণ স্পষ্ট বলিতেছে, “যাহারা পরমেশ্বরে বিশ্বাস
 স্থাপন করে, পরমেশ্বর তাহাদের রক্ষক । তিনি তাহাদিগকে
 অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যান । আর যাহারা পরমেশ্বরে
 অশ্বাস করে (কাফার), পাপের দেবতাগণ তাহাদের রক্ষক,
 তাহারা তাহাদিগকে আলো হইতে অন্ধকারে লইয়া যায় ।
 তাহারা নরকাগ্নির নিবাসী । তথায় তাহারা থাকিবে” (বকরাহ
 (২)—২৫৭) ॥ * বস্তুতঃ জাতিনির্কিশেষে মুসলেম সে, যে

* আলাহো ও-আলিযু রাজীনা আমাযু । ইযুথরেজু হুম্মি সিনাজ্
 জুলুমাতো এলামুরে । ও-আ রাজীনা কাফারু আউলিয়াউ হুম্মি তাওতো

চক্ষুস্থান, এবং সে কাফের যে অন্ধ। ইহাতেই মুস্লেম-কাফেরের প্রভেদ। কোন জাতিগত প্রভেদের এক্ষেত্রে স্থানই নাই। যে দেখে যে পরমেশ্বর তাহার রক্ষক, তাহার চিরসঙ্গী, সে প্রকৃত মুস্লেম। পরমেশ্বরের প্রভাবে সে বাক্তি সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, কর্তৃবা পালন করিতে ভীত হয় না। হিন্দু নামধারী হউক, বা মুসলমান নামধারী হউক, প্রকৃত মুস্লেমের মন সর্বদা পাপের অন্ধকার হইতে বিমুখ, এবং বিশ্বাস এবং পরমেশ্বরের পুণ্যের জ্যোতির দিকে সর্বদা উন্মুখ। যে পরমেশ্বরকে আপন রক্ষকরূপে দেখে না, “ইয়াক্বা নাস্তায়নু (১-৪) “একমাত্র তোমারই নিকটে সাহায্য ভিক্ষা করি” বলিয়া পরমেশ্বরের নিকটে সাহায্য ভিক্ষা করে না, সে কর্তৃবা পালন করিতে ভীত হয় : এবং তাহার মন পরমেশ্বরের পুণ্যজ্যোতির দিকে বিমুখ, পাপের অন্ধকারের দিকেই উন্মুখ থাকে। সে মুসলমান নাম ধারণ করুক, বা হিন্দু কি অন্য কোন নাম ধারণ করুক, সে ই প্রকৃত ‘কাফের’। প্রকৃত ধর্ম সকলেরই আত্মিক প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। প্রকৃত ধর্ম কোন জাতি বা সম্প্রদায় ভেদের স্থানই নাই। বেদোপনিষদের ঋষির প্রাণের প্রার্থনা, “তমসো মা জ্যোতির্গময়,” এবং উক্ত কোরাণ বচন, এ উভয় একে অন্তের প্রতিধ্বনি, এবং পরম্পরের সত্যতার প্রমাণ। কলেমা

ইযুধেরজুনা হুম্ব মিনা নূরে এলাজ্ জুলুমাতে। উলায়েকা আস্হাবো য়ারে হুম্ব ফীহা খালেতুনা ॥২-২৫৭॥

তমজিদ্ যেমন বলা হইয়াছে, 'আল্লা জ্যোতির্ময়'—নূর'ইয়াহ্ দি
 ল্লাহা,"—পরমেশ্বর বেদোপনিষদেও পুণোর জ্যোতিস্বরূপ,
 "তৎসুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতির্ষভদাত্তবিদো বিদুঃ"। ইঞ্জিলও
 বলিতেছে, "পরমেশ্বর আলোস্বরূপ *।" 'পরমেশ্বরের আলো'
 বলিয়াই কোরাণ ও আপন পরিচয় দিতেছে,—“কাদ্ জা-আকুম
 স্মিনাল্লাত নুরুন ও-আ কেতাবুন স্মুবীন,” “ফীতা হুদান্ ও-আ
 নুরুন” (গাউদাহ (৫) --১৫,৪৪)। কোরাণে পরমেশ্বর বলি-
 তেছেন : “তোমার নিকটে এমন গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি, যেন
 তুমি মানুষকে (কোন সম্প্রদায়বিশেষকে নয়)
 তাহাদের প্রভুর আদেশ মত, গভীর অন্ধকার হইতে আলোকে,
 — যিনি সর্বশক্তিময় এবং মহিমাম্বিত তাহারই পথে, লইয়া যাউতে
 পার” ইব্রাহিম (১৪) -- ১। পরমেশ্বর মহম্মদকে বলিতেছেন,
 “ও-আ মা আবুসাল্ নাকা এল্লা রাহ্মাতান্ লিল্ আলামীন,”
 আন্বিয়া (২১) -১০৭, আমরা তোমাকে “জাতিসকলের প্রতি
 দয়াক্রমে ভিন্ন পাঠাই নাই।” পাঠক দেখিতেছেন, কোরাণ যে
 কোন সম্প্রদায়বিশেষকে, কি জাতিবিশেষকে মাত্র সম্বোধন
 করিতেছে, তাহা নয়। কোরাণ সমস্ত মানবজাতির জন্য উপদেশ-
 স্বরূপ এবং তাহাদের হৃদিস্থিত রোগের ঔষধস্বরূপ :—“হে মানব-
 মণ্ডলী সত্যই তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালক হইতে
 উপদেশ, এবং তোমাদের অস্থিরে যে রোগ আছে, তাহার ঔষধ-

* “God is light and in him is no ,darkness at all.”
 Epistle (i) General of John, 1—5.

স্বরূপ এই কোরাণ আসিয়াছে” (ইউনুস (১০) - ৪৭) * । আবার সেই ঈশ্বরের আলো যে কেবল বাস্তবিক হৃদয়কে আলোকিত করিবার জন্য, তাহা নয় । সে আলো পৃথিবীময় মানবমণ্ডলীময় বিস্তৃত হইবার জন্য । ঈসার প্রাপ্ত আলো ইউরোপকে আলো করিয়াছিল, কিন্তু কাল তাহা নিৰ্বান হইয়া গিয়াছিল (Dark Ages) । সে আলো যখন নিৰ্বানপ্রায় হইয়াছিল, তখনই সেরাসেনদিগের দ্বারা (Saracens) প্রজ্জ্বলিত ইসলামের আলো অন্ধকারাচ্ছন্ন য়ুরোপকে অন্ধকারমুক্ত করিয়া নৃতন জাগরণের যুগে (Renaissance) আনিয়াছিল । সেই আলোর প্রভাবেই ইসলাম য়ুরোপমধ্যে স্পন্দন হইতে তুর্কি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল । বর্তমান কালে, সেই ঈশ্বরের আলোক যে খৃষ্টানের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান অপেক্ষা অধিক প্রকাশমান, কে তাহা অস্বীকার করিতে পারে । হিন্দু যেমন বহুকাল হইতে তাহার বেদ হারাষ্টয়া ফেলিয়াছে, মুসলমান যেমন তাহার কোরাণ দীর্ঘকাল বাস্তবিক করিয়া রাখিয়াছে, খৃষ্টান তাহার ইঞ্জিল সম্বন্ধে তাহা করে না, বরং জাতীয় ভাবে তাহারা ইঞ্জিলকে সর্বদা তাহাদের চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়াছে । তাই খৃষ্টান আজ জগতে অধিকতর প্রবল ।

ইসলামের প্রকৃত শিক্ষক কে ? “বল, নিশ্চয় পরামর্শের উপদেশই উপদেশ” (বকরাহ্ (১) --- ১১০), “মঙ্গলময় পরামর্শের

* “অঃমা আব্দুসসালাম্ ইল্লা রহ্-মাতান্-সাল্ব্ আলাগিন” (২১-১০৭)

. কারণ শিক্ষা দিয়াছেন, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন” । †
 “যখন আমরা উপাসকগণ তোমাকে আমার সম্বন্ধে প্রশ্ন
 করেন, তখন নিশ্চয়ই আমি অতি নিকটে । আমি প্রার্থীর
 পার্থনার উত্তর দেই, যখন সে আমাকে ডাকে । অতএব
 আমার আহ্বান তাহাদের ও শোনা করুবা, এবং আমাতে
 বিশ্বাস করা করুবা, যেন তাহারা সতাপথে চলিতে পারে”
 (বকরাত্ ১৩) ১৮৬। “তোমার প্রভু হইতে সত্য আসে, অতএব
 তুমি তর্ককারীদের মতো হইও না” (১-১৪৭) । “তিনিই যিনি
 তাহার উপাসকের জন্য পরিষ্কার উপদেশ প্রেরণ করেন, যেন
 তিনি তোমাদিগকে পবিত্র অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে আনিতে
 পারেন । নিশ্চয় পরমেশ্বর দয়াময়, এবং তোমাদের প্রতি
 কৃপাকারী” (তাওদীদ (৫৭) ৯) ॥ কারণ বলিতেছে, “পরমেশ্বর
 তাহার হৃদয় উসলামেত জন্য প্রসারিত করিয়াছেন, সে কি প ?
 সে আপন প্রতিপালকের জ্যোতিতে নিয়ত বাস কবে”
 (জুমার (৩৯) ২১) । ঠিক হিন্দু ঋষির প্রাণের কথা, সংক্ষাৎ
 অনুভূতির কথা, “তমসো মা জ্যোতির্গময় !”

. কারণে পরমেশ্বর বলিতেছেন যে, তিনি তাহার পবিত্র
 আত্মদ্বারা, “কুহেল্ কুছুসে”, তাহার উপাসককে চালনা করেন
 “পরমেশ্বর ঈসাকে তাহার পবিত্র আত্মদ্বারা বলদান করিয়া-
 ছিলেন” “ও-আ আয়াদ্নাহো বে কুহেল্ কুছুসে” (১-৮৭)।

† আর হামানো আল্লামাৎ, কুর্-আনা । খালাকাল্ ইনমানা
 ৫৫-১,২,৩ ।

এই পবিত্রাত্মাই কোরাণের “জিব্রিল” (২-৯৭)। সূরা নজ্‌মে তাহার বর্ণনা দৃষ্ট হয় (২ হইতে ১১)। খৃষ্টিয় ত্রিত্ববাদের পবিত্রাত্মা সম্বন্ধে অনেকই জানেন। “সোমো হিনোতি মতাং” (১১৮-৪) “সোম মানুষকে চালনা করে।” বৈদিক “সোম” ও যে পুরুষাকারে কল্পিত ঈশ্বর-প্রেরণার সাক্ষাতিক নাম, সে সম্বন্ধে পাঠক আমাদের ঋষেদ, ২য় ভাগে (পৃঃ ১১৬ হইতে ১৩০) যাহা বলা হইয়াছে, তাহা দেখিবেন, এবং সোমেরই রূপান্তর জরথুষ্ট্রার উপদেষ্টা “হাউম” সম্বন্ধে পাঠক আবেস্তা গ্রন্থ দেখিবেন। কোরাণ বলিতেছে :- “পবিত্রাত্মার প্রকাশ সম্বন্ধে (“কহে”) তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে। বল, আমার প্রভুর আদেশে পবিত্রাত্মার প্রকাশ। সে সম্বন্ধে যৎসামান্য ভিন্ন কোন জ্ঞান তোমাকে দেওয়া হয় নাই” (১৭-৮৫)। পরমেশ্বর তাহার উপাসকদিগের “হৃদয়ের বিশ্বাস রক্ষি করেন, এবং তাহার পবিত্রাত্মার প্রকাশদ্বারা তাহাদের বল রক্ষি করেন” “আয়্যাদাহম বে কতিন্ স্মিন্‌হা” (মুজাদিলাহ্ (৫৮)—১২)। পরমেশ্বর “তাহার আত্মার প্রকাশদ্বারা জীবকে জানাইয়া দেন, যখন সে সত্যপ্রিয় হয়, এবং যখন সে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে” (কা আল্‌হামাতা ফুজুরাহা ৬-আ তাক্‌৬-আহা—শাম্‌স (৯১)—৮)। “সিংহাসনাধিপতি ঈশ্বর, যিনি সকল শ্রেণীর উন্নতি বিধান করেন, তিনি আপন দাসদিগের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় আদেশদ্বারা আত্মা অবতারণ করেন” (মু'মেন (৪০)—১৫)। “পরমেশ্বর যাহাকে চালনা করেন, সে ই সেই ব্যক্তি যে ঠিক পথে

চলে,” (আ'রাফ (৭) - ১৭৮)। “বল, পবিত্র আত্মা (রুহুল্ কুদুসে) তোমার প্রভুর নিকট হইতে সত্যের সহিত এই কোরাণ প্রকাশ করিয়াছেন” (নাহল্ (১৬) - ১০১)। “নিশ্চয় ইতা বিশ্বের প্রাতিপালক হইতে প্রকাশিত ; বিশ্বাসী আত্মা (রুহুল্ আমিনো) ইতা লইয়া তোমার হৃদয়মধ্যে আসিয়াছে, যেন তুমি সাধারণ আরবীভাষায় সতর্ককারীদের মধ্যে হইতে পার.” (শু'আর (১৬) - ১৯২ হইতে ১৯৫)। এই সকল কথা পর্যালোচনা করিয়া আমরা বলিতে বাধা, যে প্রকৃত ইসলামের একমাত্র স্তম্ভ আল্লাহ্ বা স্বয়ং পরমেশ্বর ।*

প্রকৃত মুসলমানই বা কে ? “যে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বরের অধীন করে, এবং সংকল্প করে,” ‘মান্ আসলমা’ - আঙ্ তাহা লিল্লাহে ও-আ হ্বা মুহ্ সেনুন’ (বকরাহ (১) - ১১২)। “যে ধৈর্য এবং উপাসনার ভিতর দিয়া সাহায্য পাঠাতে চেষ্টা করে,” “ও-আস্তা-ইনু বেস্ সাব্ রে ও-আস্ সালাতে”

* যাহারা মানুষের ভিতরে পরমেশ্বরের রুহ্ বা আত্মার প্রকাশ দেখে অদিক জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা কোরাণের নির্দিষ্ট সূরা ও আয়াত দেখিবেন :- বকরাহ্ (২) - ৮৭, ৯৭, ১৪৭। ইমরান্ (৩) - ১২। নিসঃ (৪) - ১৭১। মাইদাহ্ (৫) - ১১০। আরাফ (৭) - ১৭৮। নাহল্ (১৬) - ২, ৪৩, ১০২, ১০৩। বনি ইস্রাইল (১৭) - ৮৫। মারযাম (১৯) - ১৭। আনবিয়া (২১) - ৭, ৯১। সজ্দা (৩১) - ২। ফাতেব (৩৫) - ৩১। সাদ (৩৮) - ৭০। মু'মিন (৪০) - ১৫। শু'রা (৪২) - ৫১, ৫০। হাক্কা (৪৯) - ৪৩। নফ্'ম (৫৩) - ২ হইতে ১১। হাদিদ (৫৭) - ২। মুজাদিলাহ্ (৫৮) - ২০। তাহ'রিম (৬৬) - ১২। *

(୧ ୫୧) । .ପ୍ରକୃତ ମୁସଲମାନ କେ ? ଯାହାରା ବୋଲେ, “ଆମରା
 ଈଶ୍ଵର ବିଶ୍ଵାସ କରି, ଏବଂ ଯାହା ଆମାଦର ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ ହୁଅନ୍ତାହେ,
 ଯାହା ଇସ୍ଲାମର ପ୍ରତି, ଯାହା ଇସ୍ଲାମର, ଏବଂ ଇସ୍ଲାମ, ଏବଂ
 ଇସ୍ଲାମ, ଏବଂ ତାହାଦର ବଂଶଧରାଦିଗର ପ୍ରତି, ଏବଂ ଯାହା ମୁସାକେ
 ଏବଂ ଇସ୍ଲାମ, ଏବଂ ଯାହା ଇସ୍ଲାମାଦିଗର ନିକଟେ (ନାମି-ଟନା)
 ତାହାଦର ପ୍ରତିପାଳକ କର୍ତ୍ତୃକ ପଦକୁ ହୁଅନ୍ତାହେ, ତତ୍ତ୍ଵମୁଦ୍ରେ ବିଶ୍ଵାସ
 ସ୍ଥାପନ କରି : ତାହାଦର ନାମା କାହାକେ ପୃଥକ୍ କରିନା : ଏବଂ
 ଆମରା ପରମେଶ୍ଵର ନିକଟେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଆଛି, “୧-ଆ
 ନାହ୍ନୁ ଲାହ୍ ମୁସ୍ଲେମୁନା” (୧-୧୧୬) । ଉଦ୍ଦାରତାର ପରାକର୍ଷଣ । ଅନ୍ତ
 କାନ ଧର୍ମ କି ଏକମ ଉଦ୍ଦାରତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆହୁଅଛି ? ଏହି ଉଦ୍ଦାର
 ଇସ୍ଲାମର ଭିତର ଚିନ୍ତା, ଶିଷ୍ଟାନ, ବୌଦ୍ଧ କାହାଦ ନା ସ୍ଥାନ ଆହେ ?
 ଈଶ୍ଵର ନିକଟେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଆଛି ‘ମୁସ୍ଲେମୁନା’) .
 ସେ ଚିନ୍ତା ନାମଧାରୀ ହୁଅକ, ବା ମୁସଲମାନ ନାମଧାରୀ ହୁଅକ, ସେ
 ପ୍ରକୃତ ମୁସଲମାନ । ଚିନ୍ତା ଉପନିବନ୍ଧେ ଯେମିତି “ବ୍ରହ୍ମା ଧର୍ମାକ୍ଷୟ
 ଯାହ୍ନାହାୟନ-ଦାନ”, “ସର୍ବେଣ ଏତେ ପ୍ରଣାଲୋକା ଧର୍ମାକ୍ଷୟ”, ବାଲିଆ
 ଆବାର ବାଲିଆହେ, “ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୋତ୍ରମୁତ୍ତମେଷି” “ସେ ଈଶ୍ଵର ସ୍ଥିତି
 କରେ, ସେ ଅତ୍ତମ ଲାଭ କରେ”, କାରଣେ ସେହିରୂପ ବାଲିଆହେ,
 “ସେ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ଵର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରେ, “ଆମ ଆମ୍ଲାମ
 ୧-ଆହ୍ ହାହା ଲିଲାହେ ତାହାର ଧର୍ମାକ୍ଷୟ ସର୍ବେଣାକ୍ଷୟ, “୧-ଆ
 ଆହ୍ ସାନୋ ଦୀନାନ୍ ମୟାନ୍” (୧-୧୧୧) । “ଈଶ୍ଵରର ରଂ : କେ
 ଈଶ୍ଵର ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ରଂ ଦିଅେ ପାରେ ? ଆମରା ତାହାର
 ଉପାସକ” (୧-୧୧୮) । ଈହା ସକାଳରୁ ଜାଣା କହୁବା ସେ କାରାଣର

মতে ইসলামের এবং মুসলমানের আদর্শ ইব্রাহিম। কোরাণ বলিতেছে :—“যে ইব্রাহিমের ধর্ম পরিত্যাগ করে, সে আপন নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়,” “ও-আ মান্ ইয়্যার্গাবো আন্ শ্শ্লামাত ইব্রাহিমা এল্লা মান্ সাফেহা নাফ্ সাহো” (২-১৩০)। কেন ইব্রাহিম ইসলামের আদর্শ? কারণ, যখন তাহার প্রভু আদেশ করিলেন, “আত্মসমর্পণ কর,” তিনি বলিলেন, “আমি বিশ্বসংসারের প্রভুর নিকটে আত্মসমর্পণ করিতেছি,” “এজ্ কাল্লা লাহ্ রাক্বুহা আস্লেম, কাল্লা আস্লামতো লে রবেল্ আলামিন” (২-১৩১)। পাঠক দেখিতেছেন, যে কোরাণের চক্ষে, মুসলমান নামে কোন জাতি বা সম্প্রদায় ভেদ বুঝায় না। যে যথার্থ ইব্রাহিমের মত, পরমেশ্বরের নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, সে হিন্দু নাম ধারণ করুক, অথবা মুসলমান নাম ধারণ করুক, সে ইহুদি হউক, কি খ্রীষ্টান হউক, সে ই প্রকৃত মুসলমান, তাহার ধর্মই প্রকৃত ইসলাম। অশ্রু সকলের মুসলমান নাম, মুসলমানের সন্তান বলিয়া কাহারো মুসলমান নাম, কাণাছেলের পদ্মলোচন নামের মতন ভিন্ন আর কিছু নয়; “যাবদ্বৈদে ন জায়তে”, হিন্দুর ব্রাহ্মণ নামের মত “যথা কার্তময়ো হস্তী, যথা চর্মময়ো মৃগঃ”। মোমিন কে? কোরাণ উত্তর দিতেছে :—“একমাত্র তাহারাই মোমেন, যাহাদের অস্তর যখন পরমেশ্বরের নাম উচ্চারিত হয়, তখন ভয়ে এবং ভক্তিতে অভিভূত হয়, এবং যখন তাহার বাণী সকল তাহাদের নিকট পঠিত হয়, তাহাদের বিশ্বাস তাহাতে বৃদ্ধি হয়, এবং তাহারা

তাহাদের প্রভুর উপরেই নির্ভর করে : যাহারা উপাসনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখে, এবং আমি তাহাদিগকে যাহা দিয়াছি, তাহার সদ্ব্যবহার করে”, আনফাল (৮)—১,৩। প্রকৃত মুসলমান কে ? “যাহাদের ২০ জন ১০০ জন কাফেরের সমান” (আনফাল্ (৮) --৬৫,৬৬)। বৈদিক ঋষি কবচের মত, “দুঃশাস্তুরাগাদিতি ঘোষ আসীৎ” (১০-৩৩-১), “অসহায়ো মহাবলঃ” (শকব)। “লোকে যখন তাহাদিগকে বলে নিশ্চয় মানুষেরা তোমার বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়াছে, অতএব তাহাদিগকে ভয় করিও, তাহাতে তাহাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করে, এবং তাহারা বলে, ‘আমাদের জন্য পরমেশ্বরই যথেষ্ট,—‘হাসবুনা ল্লাহা’, এবং তিনি অতি উত্তম রক্ষাকর্ত্তা”। ইমরান (৩)—১৭২।

মুসলমান কে ? আল্লাহ বলিতেছেন :—“যাহারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে, আমি যাহা দিয়াছি, তাহা হইতে বায় করে, এবং তোমার নিকটে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তোমার পূর্বে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এবং পরলোকে বিশ্বাস করে, ইহারাষ্ট তাহারা যাহারা তাহাদের প্রভুর প্রদর্শিত সত্যপথে আছে, এবং ইহারাষ্ট তাহারা যাহারা কৃতকার্য হইবে” (১-৩,৪)। “বল, আমরা পরমেশ্বরে বিশ্বাস করি, এবং যাহা আমাদের নিকটে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে, এবং ইব্রাহিমের নিকটে, ইস্মাইল, ইসাহাক, ইয়াকুব এবং তাহাদের সন্তানদের নিকটে, এবং মুসাকে এবং ইসাকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে, এবং যাহা জ্ঞানীদিগকে

(স্নাবীযুনা) তাহাদের প্রতিপালক হইতে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে (বিশ্বাস করি) । আমরা তাহাদের কাহারো মধ্যে কোন প্রকার প্রভেদ করি না, এবং একমাত্র পরমেশ্বরেই আমরা আত্মসমর্পন করি” (“নাহ্নু লাহ্ মুস্লেমুনা”, বকরাই (১)-১৩৬ : ইমরান (৩)—৮৩) । আবার “যাহারা পরমেশ্বরে এবং তাঁহার রসূল বা প্রেরিতগণে বিশ্বাস করে, এবং তাহাদের কাহারো মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করে না, আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের পুরস্কার দিবেন : এবং আল্লাহ্ ক্রমাশীল এবং দয়ালু” (নিশা (৪)—১৫১) । ইহাট কি একালের “সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের” আদর্শ নয় ? আবার নুহ্ (বৈদিক নহুষ), এবং তৎপরবর্তী ঋষি বা রসূলদের কথা বলিয়া, আল্লাহ বলিতেছেন :—“এবং রসূলগণ (প্রেরণ করিয়াছি), যাহাদের নাম পূর্বে তোমার নিকটে উল্লেখ করিয়াছি, এবং রসূলগণ যাহাদের নাম তোমার নিকটে উল্লেখ করি নাই” (৪-১৬৪) । কারণে এই নুহের বা নহুষের নামের উল্লেখ দৃষ্টেই বুঝিতে হয়, যে তাহার পরবর্তী ঋগ্বেদীয় ঋষি বা রসূলগণ ও তাহাদের অন্তর্গত, এবং যে প্রকৃত মুসলমান হইবে সে অবশ্য তাহাদিগকেও বিশ্বাস করিবে, “অগ্নিঃ বিশ ঈলাতে মানুষীয়া অগ্নিঃ মনুষো নহুষো বিজাতা” * (ঋ, ১০-৮০-৬) । বস্তুতঃ পরমেশ্বরে আত্মসমর্পনই (মুস্লেমুনা) প্রকৃত মুসলমানের মুসলমানত্ব । অতএব এই

* “মনুষ্য হইতে জাত প্রজাগণ (বিশঃ) যাহারা নহুষ হইতে উৎপন্ন, তাহারা নানারূপে জ্যোতির্ষ্ময় আল্লাহের (অগ্নিঃ) স্তুতি করে” ।

মুসলমান নামে হিন্দু-মুসলমানের উদ্দি-খৃষ্টানের সমান অধিকার। ইসলামের এই সার্বভৌমিকতাকে লক্ষ্য করিয়াই কোরাণ বলিতেছে,—“যে কেহ ইসলাম অর্থাৎ ঈশ্বরে আত্ম-নিবেদন ভিন্ন অন্য ধর্ম ইচ্ছা করে, তাহা হইতে তাহা গৃহীত হইবে না” (৩-৮৫)। এই সার্বভৌমিক তত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়াই আল্লাহ্ বলিতেছেন, “নিশ্চয় আমি প্রত্যেক জাতিতে রসূল পাঠাইয়াছি, ইহা বলিবার জন্ত, যে পরমেশ্বরের সেবা কর, এবং পাপ-দেবতার সেবা করিও না” (১৬-৩৬), “এবং এমন কোন জাতি নাই, যাহাদের মধ্যে পাপকারীর প্রতি ভয়প্রদর্শক যায় নাই” (৩৫-২৪)।

আবার হিন্দুর প্রজ্ঞাদের উপকথার মর্মের সমর্থন করিয়াই যেন কোরাণ বলিতেছে :—“বিশজন ধৈর্যশালী প্রকৃত মুসলমান যেখানে থাকে, তাহারা দুইশত জনকে জয় করিবে, এবং একশত জন যেখানে থাকে তাহারা (হিরণ্যকশিপুর মত) অশ্বিনীদিগের (রাজীনা কাফর) এক সহস্রজনকে জয় করিবে, কারণ তাহারা এমন লোক যে বুঝে না” (আনফাল্ (৮)—৬৫)। ইহাও কি সার্বভৌমিক সত্য নয়। এই প্ৰসাম্প্রদায়িক সার্বভৌমিক ঈশ্বরবিশ্বাস এবং ঈশ্বর-নির্ভরের নামই ‘ইসলাম’। “সত্যমেব জয়তে নানৃতং,” এবং সত্য বস্তুতঃ এক। এট ইসলামই, “দীনেল্ হকে”। কোন্ প্রকৃত হিন্দু বলিবে, যে ইহাট প্রকৃত হিন্দুধর্ম নয় ? এই সত্যধর্ম জগতে জয়ী হইবেই হইবে। এই সাক্ষাৎ-দৃষ্ট সার্বভৌমিক ধর্ম ভিন্ন অন্য

সাম্প্রদায়িক উপধর্ম পরমেশ্বরের নিকটে “গৃহীত হইবে না” “লান্ ইয়ুক্বালা মিন্‌হা” (৩-৮৪)। এই সাক্ষাৎ-দৃষ্ট সার্ব-ভৌমিক ঈশ্বরে আত্মসমর্পনের ধর্মকে (ইসলামকে) বৈদিক হিন্দুধর্মই বল, আর মুসলমান ধর্মই বল, ইহা সত্য, ইহা এক, ইহা বিশ্বজনীন। অপর সকল কল্পিত বা “আন্দাজের” ধর্মের উপরে (“জাঙ্গা”, ১০-৩৬) এই ইসলাম জয়ী হইবেই হইবে। তাই কোরাণ বলিতেছে :—“বল, সত্য আসিয়াছে, মিথ্যা তিরোহিত হইবে, আর ফিরিয়া আসিবে না”, সূরা সবা (৩৪)—৪৯। বেদান্তও বলে অবিজ্ঞা যখন বিজ্ঞাদ্বারা অভিভূত হয়, আর তাহা ফিরিয়া আসিতে পারে না *। আমরা কি আশা করিতে পারি না, যে হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া, জাহাজের কাপ্তান যেমন তাহার কম্পাসের কাটা দৃষ্টে পথ ঠিক করিয়া লয়, আমরাও সেইরূপে,—হিন্দু বেদোপনিষদদৃষ্টে, যাহার “স্বতঃপ্রামাণ্যং রবেরিব রূপবিষয়ে”, এবং মুসলমান কোরাণদৃষ্টে, আমাদের গম্য পথ ঠিক করিয়া লইব, এবং উভয়ে সমন্বরে বলিব “জাআল্ হাকু”, “সত্য আসিয়াছে” (৩৪-৪৯), “সত্যমেব জয়তে”। কল্পনার পথ, তর্ক, অনুমান, বা আন্দাজের পথ, বা “হতুবাদ” বা “জাঙ্গা,” বা “অন্ধের হস্তীদর্শনের” পথ পরিত্যাগ করিয়া, আমরা উভয়ে কি সাক্ষাৎ-দৃষ্ট বেদ-কোরাণের সহিত সুর মিলাইয়া বলিব না, যে “নিশ্চয় সত্যের বিরুদ্ধে

* “পৌর্বাপর্যো পূর্বদৌর্বলাং” (আমাদের ‘শঙ্করাচার্য্য ও শঙ্করদর্শন’, ২য় ভাগ, পৃঃ ৫৭ দেখ)।

কল্পনা বা আন্দাজ অনুমাত্রও জয়ী হইবেনা”, “ইম্মা জ্জাম্মা লা ইয়ুগ্নী মিনাল্ হাক্কে শাঈয়ান্” (ঔরুনুস (১০)—৩৬), বলিব না, যে “অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে তাহারা না জানিয়া দূর হইতে আন্দাজি কথা সকল নিক্ষেপ করিয়া থাকে,” “ইয়াক্ জ্জফুনা বেল্ গাঈবে মিন্ শ্বাকানিন্ বাইদিন্”,—(সবা (৩৪)—৫৩), বলিব না যে “সত্যমেব জয়তে নানৃতং, সত্যেন পশ্চা বিততো দেবযানঃ” ? পাঠক, তুমি বল, ঈসলামের আল্লাহ আর হিন্দুর পরমেশ্বর এক, কি এক নয় ? যদি এক না হয়, তবে কোরাণ ও বলিতেছে :—“লাঈ কানা ফীহেমা এলাহাতুন্ এল্লাল্লাহে লা ফাসাদাতা” (আনবিয়া (২১)—২২), “পৃথিবীতে যদি আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য ঈশ্বর থাকে, তবে তাহাদের মধ্যে গোলযোগ হইত”,—আজ কাল যেমন মুসলমানদের সহিত হিন্দুদের মাথা ফাটাফাটি হইতেছে । শঙ্কর ও বলিতেছেন, যে অনেক ঈশ্বর হইলে, “চৈষামনৈকমত্যে কস্মচিৎ স্থিত্যভিপ্রায়ঃ কস্মচিৎ সংহারাভিপ্রায় ইতোবং বিরোধোপি কদাচিৎ স্তাৎ” (সূত্রভাষ্য ৪-৪-১৭) *। এক ঈশ্বর আল্লাহ, আর এক ঈশ্বর পরমেশ্বর,—এই যদি হয়, তবে এ দুইয়ে বিবাদ অবশ্যস্বাভাবী, এবং মাস্ত্রাজে শৈব-বৈষ্ণবের ভীষণ বিবাদের মত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেও বিবাদ অবশ্যস্বাভাবী । অপরদিকে যদি মুসলেমের আল্লাহ্ ই হিন্দুর পরমেশ্বর হয়, তবে এক বাপের দুই ছেলের মধ্যে বিবাদ যেমন তাহাদের বাপের পক্ষে কষ্টকর, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাদ ও সেইরূপ আল্লাহ্ বা

* আমাদের ‘কোরাণের সূরা, বেদের সূক্ত’ (পৃ: ৪৫, ৪৬) দেখ ।

পরমেশ্বরের পক্ষে মহা কষ্টকর । পরমেশ্বর আপ্তকাম বা অভাব-শূন্য—“গণী” । অতএব ইহা হইতে পারে না । অতএব ঈশ্বর যেমন এক, সত্য যেমন এক, মানব-প্রকৃতি যেমন এক, প্রকৃত হিন্দুধর্ম এবং প্রকৃত ইসলামও এক, হিন্দুমুসলমানও এক, এবং আল্লাহ্ বা পরমেশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিতে হইলে, উভয়ের এক কর্তৃবা, যে “পরমেশ্বরের রজ্জ্ব একত্রে দৃঢ় করিয়া ধরে, এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়” (ইমরান্ (৩)—১০২-৩) । আমরা নিম্নে আল্লাহ সস্বন্ধে কতিপয় কোরাণ-বচন উপস্থিত করিতেছি : আশা যে হিন্দুমুসলমান উভয়ে বুঝিতে পারিবেন, যে ইসলামের আল্লাহ্ এবং হিন্দুর পরমেশ্বর এক,—এবং হিন্দুমুসলমান এক ।

বকরাহ (১) :—“পূর্বদিক্ ও আল্লাহের এবং পশ্চিমদিক্ ও আল্লাহের, অতএব তুমি যে দিকেই ফির, সেঐ দিকেই আল্লাহের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় (১১৫) : এবং তাহারা বলে যে পরমেশ্বর একটি পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন : ধন্য তিনি, ছ্যলোকে এবং ভুলোকে যাহা কিছু আছে, সকলই তাঁহার (পুত্রবৎ) : বরং সকলেই তাঁহারই অধীন”(১১৬)। “ছ্যলোক ও ভুলোকের আশ্চর্য্য সৃষ্টিকর্তা, এবং তিনি যখন কোন বিষয় আদেশ করেন, তিনি এইমাত্র বলেন, ‘হুও’, অমনি তাহা উপস্থিত হয়” (১১৭) †। “ইচ্ছামাত্রঃ প্রভোঃ

+ ঋগ্বেদ বিশ্বকর্মা সস্বন্ধে বলিতেছে :—“বিশ্বতশ্চকুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাং । সং বাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈগ্ণী বাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ” ॥১০-৮১-৩॥ “তাঁহার চক্ষু সর্বত্র, মুখ সর্বত্র, তাঁহার হস্তপদ ও সর্বত্র । সেই এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর বাহুদ্বারা ছ্যলোক এবং

সৃষ্টিঃ”, (গোড়শাদীয় মাণ্ডুক্য-কারিকা, ১-৮) । “এবং তোমার ঈশ্বর একমাত্র, তিনি ভিন্ন অন্য ঈশ্বর নাই” (১৬৩) * । “আল্লাহ তিনি, যিনি ভিন্ন অন্য ঈশ্বর নাই, তিনি নিত্য জীবন্ত স্বয়ম্ভু, “হায়ুল্ কায়ান্” । তাঁহার সিংহাসন দু্যালোক-ভুলোকময় বিস্তৃত ; এ উভয়কে রক্ষা করিতে তাঁহার আয়াস বোধ হয় না, তিনি সর্কোচ্চ, তিনি মহান্” (২৫৫) । “পরমেশ্বর তাহাদের রক্ষক, যাহারা তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে : তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যান” (২৫৭) । “আল্লাহ কোন লোকের উপরে এমন কার্যের আদেশ করেন না, তাহার শক্তির পরিমাণ অনুসারে ভিন্ন” (২৮৬) ।

ইমরান (৩) :—“নিশ্চয় আল্লার নিকটে ইসলাম অর্থাৎ তাঁহার নিকটে আত্মসমর্পণের ধর্মই ধর্ম” (১৮) । “তোমাদের হৃদয়ে যাহা আছে, তাহা গোপনই কর, আর প্রকাশই কর;

পদদ্বারা ভুলোককে চালনা করিয়া, উৎপন্ন করিলেন” । একদা সপ্তকে বলিতেছে :—“মানেনেব ভূমিবী অস্তুরিগ্গে দিবো মনে পৃথিবীঃ সূর্যেণ” (৫-৮৫-৫), “যিনি অস্তুরিগ্গে থাকিয়া, যেন সূর্যকে মাপকাঠি করিয়া, পৃথিবীকে নির্মাণ করিয়াছেন ।”

* “অং ভুবঃ প্রতিমানং পৃথিব্যা ঋষীরশ্চ বৃহতঃ পতিভূঃ । বিশ্বমাশ্রা অস্তুরিগ্গং গতিজ্ঞা সত্যমদ্রা নকিরনাস্ত্রাবান্” । ঋগ্বেদ ১-৫২-১৩। “তুমি পৃথিবীর গায় বিস্তীর্ণ, তুমি দেবলোকের অধিপতি, নিশ্চয় সমস্ত অস্তুরীক তোমার মহিমাধারা তুমি পূর্ণ করিয়াছ, অংএব ইহা অতি সত্য যে তোমার মত অন্য কেহ নাই” । ঋগ্বেদ ১-৫২-১৩ ।

আল্লাহ্ তাহা জানেন" (২৮)। ~~যেদ ও বুদ্ধি জহু~~, "অন্তঃপশুস্তি
 রুজিনোত সাধু" (ঋ, ২-২৭-৩)। ~~গুরুদেব নধাকিয়া ভালমত~~
 দর্শন করেন"। "নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার ও ~~প্রভু তোমার ও~~
 প্রভু। অতএব তাহার সেবা কর। ইহাই সত্য পথ"। ৫০।
 "আল্লাহ্ ঐর্ষাশালীকে ভালবাসেন" ১৪৫। "যাহারা সংকল্প
 করে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন" (১৪৭)। "আল্লাহ্
 তোমার সহায় এবং তিনি সাহায্যকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ" (১৪৯)।
 "আল্লাহ্ যদি তোমার সাহায্য করেন, তবে এমন কেহ নাই,
 যে তোমাকে পরাভূত করিতে পারে, এবং তিনি যদি তোমাকে
 পরিত্যাগ করেন, তাহার পর এমন কে আছে, যে তোমার
 সাহায্য করিতে পারে" ? (১৫২)।

নিসা (৪) -- "আল্লাহ্ তোমার শত্রুদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক
 জানেন : এবং আল্লাহ্ ই যথেষ্ট রক্ষক, আল্লাই যথেষ্ট সাহায্য-
 কারী" (৪৫)। ঋখেদ ঋষি কুর্ম বলিতেছেন :— "হে বরণীয়
 পরমেশ্বর (বরুণ), তোমার সাহায্য ভিন্ন আমি চক্ষুর পলক
 ও ফেলিতে পারি না," "ন হি স্বদারে নিমিষচনেশে," ২-২৮-৬।
 "আল্লার নিকটে কমা প্রার্থনা কর ; নিশ্চয় তিনি কমাশীল,
 দয়ালু" * (১০৬)। "কাহার উৎকৃষ্টতর ধর্ম আছে,

* "যচ্চিচ্চি তে পুরুষত্বা যবিষ্ঠাচিচ্চিভিচ্চকমা কচ্চিমাগঃ। কুধী স্বম্ম।
 আদিতেরনাগাষোনাংসি শিপ্রথো বিষগয়ে" ॥ ঋখেদ, ৪-১২-৪ ॥ "হে
 সুবতম জ্যোতির্ময় (অগ্নি), নিবুদ্ভিতাহেতু লোকমধ্যে যে কোন পাপ
 করিয়াছি, অনন্তের নিকটে তুমি আমাদিগকে পাপশূন্য কর। আমাদের সমস্ত
 পাপ কমা কর"।

যে আল্লাহর নিকটে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে, এবং সংকল্প করে, তাহার অপেক্ষা” (১২৫) ? আমাদের “জীব দয়া, নামে ভক্তির” ও ত ইহাট অর্থ। “আল্লাহ্ সকল বস্তুকে বেষ্টন করিয়া আছেন” (১২৬) : “অগ্নে নেমিরর” ইন দেবাংস্তুঃ পরিভূরসি” (ঋ, ৫-১৩-৬), “হে জ্যোতির্ময় পরমেশ্বর, রথ-চক্রের নেমি (rim) যেমন খিলি সকল (spokes) বেষ্টন করিয়া থাকে, তুমিও সেইরূপ দেবগণকে বেষ্টন করিয়া আছ।”

আনাম (৬)—“তাহার বাক্যই সত্য” * (৭৪)। “দৃষ্টি তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, এবং তিনি সকলের দৃষ্টিকে গ্রহণ করেন” (১০৪)। “যন্মানসা ন মনুতে, যেনাহ্মনো মতং” (কেন, ৫)। “পরমেশ্বর তাহাদিগকে ভালবাসেন, যাহারা আপনাদিগের কর্তব্য পালন করে,” “যাহারা আপনাদিগকে পবিত্র করে” (তাওবা (৯)—৪-১০৮) † ।

ইয়নুস (১০) —“তিনিই যিনি সূর্য্যকে উজ্জ্বল আলোকরূপে এবং চন্দ্রকে আলোকরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাহার জন্ত রাশিসকল (মানাজিলা—Mansions) রাখিয়াছেন, যেন তোমরা বৎসর গণনা, এবং সেই গণনার প্রণালী জানিতে পার” (৫) ।

* “গোরীমিমায় সলিলানি তক্ষতী” (ঋ, ১-১৬৪-৪১), “ঈশ্বরের শব্দ বৃষ্টি-জল নিখান করিতেছে” ।

† “Blessed are the pure in heart for they shall see God” (Matth, 5-8) ।

হুদ (১১) :—“পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নাষ্ট, যাহার
অঙ্গের ব্যবস্থা আল্লাহর উপরে নির্ভর করে না : বরং তিনি
তাহার বিশ্রাম স্থান এবং বাসস্থান জানেন” *(৬)

রা'দ (১৩) :—“আল্লাহ্ তিনি যিনি এমন ভাবে ছােলোককে
টেক্কে ধারণ করিয়াছেন, যে তাহাতে কোন স্তম্ভ ভুমি দেখিতে
পাওনা, এবং তাহার শক্তি দৃঢ়, এবং তিনি সূর্য্য এবং চন্দ্রকে
তোমাদের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন (১) † ।

ইব্রাহিম (১৪) :—“ভুমি যাহা কিছু তাহার নিকট প্রার্থনা
কর, তিনিই তাহা প্রদান করেন : এবং যদি ভুমি পরমেশ্বরের
অনুগ্রহ গণিতে যাও, ভুমি তাহা গণিতে পারিবে না । নিশ্চয়
মানুষ অত্যন্ত অন্যাযকারী, অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ” । ৩৪ ।

নাহুল (১৬)—“নিশ্চয় তোমাদের জন্ত গো-মেঘাদির মাধা
ঈপদেশ আছে । তাহাদের পোট বিষ্ঠাধার এবং মূত্রাধারের
মধাস্থানে যাহা আছে, বিশুদ্ধ দুগ্ধ, তাহা হইতে তোমাদিগকে
পান করিতে দেই : যাহারা পান করে, তাহাদের পক্ষে তাহা সহজ
পাচ্য এবং খাষ্টতে সুমিষ্ট” ৬৬ ‡ । সূরা মুমিনুন (২৩)-২১
ও দেখ ।

* “বেদা যো বীনাং পদমস্তুরিক্কেণ পততাং । বেদ নাবঃ সমুদ্ভিয়ঃ” ॥
ঋগ্বেদ, ১-২৫-৭ ॥ “যিনি আকাশগামী পক্ষী সকলের স্থান জানেন, সমুদ্রগামী
নৌকা সকলের স্থান জানেন” ।

† “ধীরা জন্ত মহিনা জনুংসি বি যন্তস্তস্ত রোদসী চিদুর্কা ॥
ঋ, ৭-৮৬-১” ॥ “তিনি বিস্তীর্ণ আকাশ পৃথিবীকে স্থির রাখিয়াছেন” ।

‡ “আমা পকং চরতি বিভ্রতী গোঃ” (৩-৩০-১৪), “নব গ্রন্থতা গাভী
পাক করা দুগ্ধ ধারণ করিয়া, বিচরণ করে” । • “বনেষু বাস্তুরিক্কে

বণি উশ্রাটল (১৭) :—“সমস্ত দু্যলোক এবং পৃথিবী তাঁহার মহিমা কীর্তন করে, এবং যাহারা তথায় বাস করে। এমন কোন বস্তু নাই, যে স্তবদ্বারা তাঁহার মহিমা কীর্তন না করে, কিন্তু তুমি তাহাদের কীর্তন বুঝ না” (৪৪)। বেদ ও বলিঃ :— “বি যস্তস্তস্ত বলিমা রজাংসি” (ঋ, ১-১৬৪.৬), “যিনি এত ছয় লোক ধারণ করিয়া আছেন”। “নিশ্চয় তোমার প্রভু তোমাকে বেষ্টিন করিয়া আছেন” (৬০) ।

কাহ্ফ (১৮) :—“আমার প্রভুর বাকালিপিজন্য সমুদ্র যদি কালি হইত, আমার প্রভুর বাক্য শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র শুকাইয়া যাউত, যদিচ সেই সমুদ্রের সমান অন্য সমুদ্র তাহাতে যোগ করিতাম” (১০৯), (লুকমান (৩১)—২৭ ও দেখ) ।

তাহা (১০) :—“উৎকৃষ্ট নাম সকল তাঁহারই” (৮) । “তোমাদের উপাস্ত একমাত্র আল্লাহ্, তিনি ভিন্ন ঈশ্বর নাই। তিনি তাঁহার জ্ঞানদ্বারা সকল বস্তু বেষ্টিন করিয়া আছেন” (৯৮) । “আল্লাহ্ তিনি যিনি সাতীত ঈশ্বর নাই” ।

ততান বাজমবৎসু পর উশ্রিয়ানু । হুংসু ক্রতুং বরুণো অঙ্গুগ্নিঃ দিবি সূর্য্য-
মদমাং সোমঃদ্রৌ” ॥ ঋগ্বেদ, ৫-৮৫-২॥ “বরুণীর পরমেশ্বর (বরুণঃ)
ব্রহ্মাণ্ডে বায়ু বিস্তার করিয়াছেন, অশ্বের মধ্যে বল, গাভীর মধ্যে দুগ্ধ
দিয়াছেন, হৃদয়-মধ্যে কৰ্ম্মকরিবার সঙ্কল্প (ক্রতুঃ) দিয়াছেন, জলের মধ্যে
বিদ্যাহাগ্নি বা বাড়বাহ্নি রাগিয়াছেন, আকাশে সূর্য্যকে স্থাপন করিয়াছেন,
এবং পর্কতে সোমলতা উৎপন্ন করিয়াছেন” । ঋগ্বেদে গো-ছন্দাদি
বিষয়ে অষ্টার সৃষ্টিকৌশল সম্বন্ধে পাঠক আমাদের ঋগ্বেদ, ১ম ভাগ, পৃঃ ১১৬-১৬০, দেখিবেন ।

নূ'মিনুন (২৩) :- “তিনিই যিনি তোমাদের জন্ম কর্ণ এবং চক্ষু, এবং হৃদয় গড়িয়াছেন, তোমরা অতি কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর” (৭৮)। “বল, কে তিনি যাঁহার হাতে বিশ্বসংসারের রাজত্ব, যিনি সকলকে সাহায্য দেন, যাঁহার বিরুদ্ধে কোন সাহায্য দেওয়া হয় না, যদি তোমরা জান” (৮৮) ?

নূর (২৪) :- “পরমেশ্বরই দু্যলোকের এবং ভূলোকের জ্যোতি, জ্যোতির উপর জ্যোতি : পরমেশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন, আপন জ্যোতির দিকে পথ প্রদর্শন করেন” (৩৫)। “তস্মা ভাসা সর্কমিদং বিভাতি।” কঠ, ২-৫-১৫ ॥

লুক্‌মান (৩১) :- “দিনা স্তৃষ্টে তিনি দু্যলোক সৃষ্টি করিয়াছেন, যেমন তোমরা দেখিতেছ, এবং পৃথিবীর বাক পর্বতসকল স্থাপন করিয়াছেন, পাছে তাহা তোমাদিগকে সচ কল্পিত হয়” (১০)। “আল্লাহ্ সত্যস্বরূপ” (৩০)। “তৎ সত্যং স আত্মা” ॥ (ছা, ৬-৮-৩), “সত্যং জ্ঞানমনস্ত্বং ব্রহ্ম” (তৈ, ২-১-১)।

ফাতির (৩৫) :- “নিশ্চয় পরমেশ্বর আবারপৃথিবীকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, যেন তাহারা নষ্ট না হয়” (৪১), “স সেতুবিধ্বতিরেষাং লোকানাংসমস্তদায় ॥” ছান্দোগ্য, ৮-৯-১ ॥

সাদ (৩৮) :- “কি, সে কি ঈশ্বরদিগকে এক ঈশ্বরে পরিণত করে” (৫) ? *

* রামমোহন রায়েব পৌত্র হরিমোহন বলিয়াছিল, “আমার ঠাকুরদাদা তেঁজেকেটা ঈশ্বর উড়াইয়া দিয়া, এক ঈশ্বর করিয়াছিল। তাঁহার পৌত্র হইয়া, আমি কি সেই একটিমাত্র ঈশ্বরকেও উড়াইয়া দিতে পারি না” ?

মুমিন (৪০) :—“হে আমাদের প্রভো. তুমি তোমার জ্ঞান এবং দয়াদ্বারা সকল বস্তু ঘিরিয়া আছ, অতএব যাহারা (কুপথ হইতে) নিরস্ত হইয়াছে, ও তোমার পথে চলিয়াছে, তাহাদিগকে নরকের শাস্তি ভোগ হইতে রক্ষা কর” (৭) * ।

“তোমার প্রভু বলিতেছেন, আমাকে ডাক, আমি তোমাকে উত্তর দিব” [৬০) ।

হা মিম্ (৪১) :—“বল, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মত মানুষ ভিন্ন নই । আমার প্রতি আদেশ হইয়াছে, যে তোমাদের পরমেশ্বর একমাত্র পরমেশ্বর ; অতএব তাঁহার দিকে সতাপথ অনুসরণ কর, এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর (৬) * । তোমাকে এমন কিছু বলা হইতেছে না, যাহা তোমার পূর্ববর্তী প্রেরিতদিগকে বলা হয় নাই” (৪৩)।

আহ্ কাফ (৪৬) :—“বল, আমি প্রেরিতদিগের প্রথম নই, এবং আমি জানি না আমার প্রতি কি করা হইবে, অথবা তোমাদের প্রতি কি করা হইবে । আমার নিকট যে প্রত্যাদেশ হইয়াছে তাহা ভিন্ন, আমি অশু কিছুর অনুসরণ করিনা, এবং আমি স্পষ্ট সতর্ককারী ভিন্ন অশু কিছু নহি” ৥২।

* “অর্থমাং বরুণ মিত্রাং বা সখায়ং বা সদমিত্র্যাতরং বা । বেশং বা নিত্যং বরুণারণং বা যৎ সীমাগচ্চকুমা শিশ্রথস্তৎ” ॥ ঋগ্বেদ, ৫-৮৫-৭॥ “হে বরণীয় পরমেশ্বর (বরুণ), উপকারকের বিরুদ্ধে (অর্থমাং), মিত্রের বিরুদ্ধে, অথবা আমার নিত্য সহচরের বিরুদ্ধে, বা ভ্রাতার বিরুদ্ধে, বা প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে, বা দরিদ্রের বিরুদ্ধে (অরণং) আমি নিয়ত যে সকল অপরাধ করিয়াছি, তুমি তাহা বিনাশ কর ।”

ফাৎহ্ (৪৮) :—“মহম্মদ পরমেশ্বরের প্রেরিত” (২৯) ।

কাফ (৫০) :—“এবং নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি, এবং আমি জানি তাহার মন তাহার নিকটে কি বলে, এবং আমি তাহার জীবনের শিরা অপেক্ষা ও তাহার অধিক নিকটে, “ও-আ নাহ্নু আকরাবো এলায়াহে মিন্ জাবলেন্ ও-আরিদে ।” ১৬৭ *

* বাহার। আল্লাহ্ সম্বন্ধে কোরানে আর ও যাহা আছে, জানিতে ইচ্ছা কবেন, তাঁহারা নিম্ন লিখিত সূরা ও আয়াত দেখিবেন :—

বকরাহ (২) — ১১৫, ১১৭, ১৫২, ১৬৩, ১৬৪, ২৫৫, ২৫৭, ২৮৬ । ইমরান (৩) — ৫, ২৫, ২৬, ২৮, ৫০, ১০৮, ১৪৯, ১৫৯, ১৭২, ১৭৮, ১৮৮ । নিসা (৪) — ৪০, ৪১, ১০৬, ১০৮, ১২৬, ১৩২ । আন্'আম (৬) — ১ হইতে ৩, ১৪, ১৭, ৪৬, ৫৪, ৫৯, ৬০, ৭৩, ৭৪, ৯৯, ১০৩, ১০৪, ১৪২ । আ'রাফ (৭) — ২৮, ২৯, ৫৪ হইতে ৫৬ । বরা'আংবা তাওবা (৯) — ১০৮, ১০৯, ১১৬ । ইয়ুনস্ (১০) — ৫, ৬, ২২, ২৩ হইতে ২৭, ৩১, ৩৪, ৩৬, ৪৪, ৬১, ৬৭ । হুদ (১১) — ৫, ৬ । বা'দ (১৩) — ২, ৩, ৪, ৮ হইতে ১৮ । ইব্রাহিম (১৪) — ৩২ হইতে ৩৪, ৩৮ । হিজ্ৰ (১৫) — ১৬ হইতে ৪৪, ৮৫ হইতে ৮৭ । নাহ্ল (১৬) — ২ হইতে ২৩, ৪০, ৫১, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৬৯, ৭২, ৭৪, ৭৭ হইতে ৮২ । বনি ইস্রাইল (১৭) — ১২, ৪৪, ৬৬, ৬৭ । কাহ্ফ (১৮) — ৬, ৭, ৮, ১০ হইতে ১৬, ১০৯ । তাহা (২০) — ৯৮, ১১০ । আন্'বিয়া (২১) — ১৬, ৩০ হইতে ৩৩ । হজ্ (২২) — ৫, ৬, ১৮, ৫৮ হইতে ৬৬ । মু'মিনুন (২৩) — ১২ হইতে ২১, ৭৪, ৭৫, ৭৮ হইতে ৮০, ৮৪ হইতে ৯১ । জুর (২৪) — ৩৫, ৪১ হইতে ৪৫ । ফুরকান (২৫) — ৪৭, ৪৮, ৫৩, ৫৪, ৫৮, ৬১ । শু'আরা (২৬) — ৭৯ হইতে ৮৩ । নাম্ল (২৭) — ৬০ হইতে ৬৫, ৭৩, ৭৪, ৮৬, ৮৮ । কাসাস্ (২৮) — ৬৯, ৭০, ৭৩ । আন্কাবুং (২৯) — ৬, ২১, ২২, ৪৪, ৪৬, ৫৬, ৫৮ হইতে ৬৩ । সজদাহ্

কোরাণে সালাৎ, নমাজ, বা উপাসনা ।

“ব্রহ্ম বক্ষ্য মমাস্তুরং ।” ঋগ্বেদ ৬-৭৫-১৯ ।

“উপাসনা আমাব অহি নিকট বক্ষ্যক৭৫” ।

প্রচলিত নমাজের (সালাৎ) কতটুকু হজরতের সময়ে প্রবর্তিত হইয়াছিল, কতটুকু হজরতের লোকান্তর গমনের পাবে প্রবর্তিত, বলা কঠিন । হজরত মহম্মদের লোকান্তর গমনের সন্ধ্যা সন্ধ্যাই মুসলমানেরা দুই দলে বিভক্ত হইয়াছিল :— সিয়া বা আলিফতেমার দল, এবং শুন্নি বা আবুবকর-আয়েশার দল ।

(৩২)—৪ হইতে ৯,২৭ । লুক্‌মান (৩১)—১০,১৪,১৬,১৮,২০,২৬,২৭,৩০, ৩১,৩২ ৩৪ । শাবা (৩৪)—১,২ । কাহির (৩৫)—৩,৯ হইতে ১৩, ২৭, ২৮, ৩৮,৪১,৪৫ । এয়াসিন্ (৩৬)—১২, ৩৬ হইতে ৪০, ৬৮,৮২ । সাক্‌ফাৎ (৩৭)—৪,৫,৭৫ । সাদ (৩৮)—১ । জুমার (৩৯)—৭,৮,৩৬,৩৭,৩৮,৫৩, ৬১,৬২ । মূসিন (৪০)—৩,৭,১৩,৬০,৬৫,৬৮ । হামিম (৪১)—১১,১২, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৫৭ । সুরা (৪২)—৩, ৪, ৫, ৯, ১১, ১৫, ১৭, ২৭, ২৮, ২৯,৪৯ হইতে ৫৩ । জুধরুফ (৪৩)—১০,১১,৬৪,৮০ । জামরা (৪৫)— ৩ হইতে ৫,১২,১৩,২২,৩৬,৩৭ । আঙ্কাফ্ (৪৬)— ৩ । কাৎফ্ (৪৮)— ৪ । কাফ্ (৫০)—৬ হইতে ১১,১৫,১৬,৩৮ । জারিমাত্ (৫১)—৪৭ হইতে ৫০ । নজ্‌ম (৫৩)—৩১,৩২,৪২ হইতে ৪৮ । রহ্মান (৫৫)— ৫ হইতে ২৯ । বাকি'আত্ (৫৬)—৫৮ হইতে ৭৪,৮৫ হইতে ৮৯ । হাদিদ্ (৫৭)—১ হইতে ১০,১৭,২২,২৩,২৮,২৯ । মুজাদিলাত্ (৫৮)—৭ । হাশর (৫৯)—১,২২,২৩,২৪ । জুমু'আত্ (৬২)—১,২ । তাঘাবুন্ (৬৪)—১ হইতে ৪,১১,১৩,১৫,১৭,১৮ । তালাক্ (৬৫)—১২ । মুন্‌ক (৬৭)—১ হইতে ৫,১৩,২২ হইতে ২৬ । তিন্ (৯৫)—৮ । ইখলাস (১১২)—১ হইতে ৪ ।

এই দুই দলের মাঝে মনোমালিন্যের লক্ষণসকল হজরতের
 মৃত্যুশয্যাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। সিয়া এবং শুন্নি
 দলের প্রচলিত নমাজ বা উপাসনাতে যাহা উভয়ের মধ্যে
 সাধারণ, তাহা নিশ্চয় হজরতের সময়ের সালাতেই বর্তমান
 ছিল। কোরাণে দেখা যায়, হজরতের সময়েই আজান
 দেওয়া হইত “এজা নুদিয়া লে সালাতে” (৬২-৯), “যখন
 উপাসনার জন্য আহ্বান করা হয়,” এবং বিখ্যাত মুক্তদাস
 বেলালের উপরে তখন আজান দেওয়ার ভার ছিল। এখন
 যে ভাবে আজান দেওয়া হয়, হজরতের সময়েও, বোধ হয়, সেই
 ভাবেই আজান দেওয়া হইত। মুসলমানগণ যে হজরতের সময়েই
 একটি সুগঠিত উপাসক-মণ্ডলীর আকার ধারণ করিয়াছিল—
 তাহা “ও-আ'রু কা'ই মা-আ র'াকি-ইনা” (১-৪৩)—“উপাসক-
 মণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়া উপাসনা কর,” ইত্যাকার আয়াত
 সকল হইতেই প্রতিপন্ন হয়। তখন যে উপাসনার বিশেষ
 বিশেষ সময়ও নির্দ্ধারিত ছিল, তাহাও “ইন্না সালাতা কানাত্
 আলাল্ মুমেনীনা কিতাবান্ সাওকুতান্” (নিসা (৪)—১০৩),
 “নিশ্চয় বিশ্বাসীদের জন্য উপাসনা সময়বান্কা আদেশ,” এই
 আয়াতদ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু পাঁচ বেলাই যে নমাজ
 পড়িতে হইবে, কোরাণে এমন কোন বিশেষ বিধি দৃষ্ট হয় না।
 সূরা ফাতেহার সাতটি আয়াতও যে খ্রীষ্টবাদের “প্রভুর প্রার্থনার”
 ন্যায়, একালের মত, হজরতের সময়েই সামাজিক উপাসনাতে
 নিয়ত পঠিত হইত, তাহাও “ও-আ লাকাদ্ আতাইনাকা

সব্-আন্ স্মিনাল্ মসানী ও-আল্ কুরুআনাল্ আজীম” (হেজর (১৫)—৮৭) “নিশ্চয় আমরা সর্বদা উচ্চারিত আয়াত-সপ্তক এবং মহাকোরাণ তোমাকে প্রদান করিয়াছি”— এই আয়াত দুইটি প্রতিপন্ন হয়। হিন্দুর যোগাসুন সম্বন্ধে পাতঞ্জল দর্শন বলিতেছে :—“স্থিরমুখমাসনং” (১-৪৬), “যে ভাবে বসিলে শরীর স্থির থাকে, এবং আরাম হয়, তাহাই আসন.” কোরাণে ও ঈশ্বরচিন্তা সম্বন্ধে কোন বাধাধরা আসনের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না :—“দুয়ালোক ভূলোকের সৃষ্টিতে এবং দিবারাত্রির গমনাগমনের ভিতরে চিন্তাশীল লোকদিগের জন্ম নিশ্চয় নিদর্শন সকল রহিয়াছে.-- যাহারা ঠাড়াইয়া, বসিয়া, এবং দেহপার্শ্ব শুইয়া আল্লাহকে স্মরণ করে, এবং দুয়ালোক ও ভূলোক বিষয়ে চিন্তা করে : হে আমাদের প্রভু, তুমি এসকল রূথা সৃজন কর নাই। তোমার নাম ধন্য হউক, আমরাদিগকে অগ্নিদণ্ড হইতে রক্ষা কর” (ঈমরান্ (৩)---১৮৯, ১৯০)। কোরাণের সময়ে সালাত বা উপাসনার প্রণালীর ভিতরে ও “অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থার” বিধান ছিল :— “উপাসনাতে সর্বদা মনোযোগী থাক, এবং যত্ন করিও যেন, খুব ভাল উপাসনা হয়, এবং অকপট ভাবে ইশ্বরের অধীন হইয়া ঠাড়াও। কিন্তু যদি বিপদ আশঙ্কা কর, তবে তখন ঘোড়ার পীঠে থাকিয়া, অথবা পদাতিক হইয়াই উপাসনা কর। এবং যখন নির্ভয় হইয়াছ, তখন যেমন তিনি শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা তোমরা জানিতে না, সেই প্রণালী মত পরমেশ্বরকে স্মরণ কর”

“ফাজ্জুরু ল্লাহা কামা আল্লামাকুম্মা লাম্ তাকুনু তা'লামুন”
(২-২৩৮,২) । কোরাণের সালাতের সঙ্গে আর একালের
অন্তঃ বঙ্গীয় মুসলমানদের নমাজের সঙ্গে যে একটি মহাপার্থক্য
দৃষ্ট হয়, তৎপ্রতি আমরা মুসলমান-সাধারণের বিশেষ
মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি । কোরাণই বলিতেছে, যে
আরবদেশের লোক বুঝিতে পারিবে, এজন্যই আরবি ভাষায়
কোরাণের প্রকাশ,--“নিশ্চয় আমরা ইহাকে আরবি কোরাণ
করিয়াছি, যেন তোমরা বুঝিতে পার,” (জুখুরফ্ (৪৩)-৩) ।
আবার কোরাণ স্পষ্টে নিষেধ করিতেছে, যে না বুঝিয়া কোন
কার্য করিও না, “যে বিষয় সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নাই,
তাহার অনুসরণ করিও না” (বনি-ইস্রাইল (১৭)---৩৬) ।
সালাত বা নমাজে যাঠিতে পর্য্যন্ত কোরান স্পষ্টভাবে নিষেধ
করিতেছে, যতক্ষণ না তাহারা সালাত বা নমাজে যাহা বলা হয়,
তাহার অর্থ বুঝিতে পারে, “হে বিশ্বাসীগণ উপাসনার নিকটে যাঠিও
না, যখন তোমরা মত্ত অবস্থায় থাক, যতক্ষণ না তোমরা বুঝিতে
পার, তোমরা কি বল” । নিসা (৪) -৪৩' । আবার এই সঙ্গে
কোরাণ বলিতেছে, “এবং যখন তোমাদের স্নান করা কর্তব্য যদি
তোমরা পথভ্রমণকারী না হও (উপাসনার নিকটে যাঠিও না)
যতক্ষণ না তোমরা স্নান করিয়াছ । এবং যদি তোমরা জল না
পাও, তবে পরিষ্কার মাটি ব্যবহার কর । এবং তদ্বারা তোমাদের
হাত মুখ মুছ” (নিসা (৫)—৪৩) । উপাসনাদির জন্য হিন্দুর
যেমন “মুজ্জলাদিভিরাক্ষালয়ন” কায়শুদ্ধি সাধন করিতে হয়,

(পাতঞ্জল, ব্যাসভাষ্য, ১-৪০), কোরাণে ও দেখা যায়. তাঁহার অনুরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে ।

কোরাণে উপাসনার প্রস্তুতির জন্য যে 'উজু' বা বাহ শুচির ব্যবস্থা আছে, তাহা এই :- “হে বিশ্বাসীগণ, যখন তোমরা নমাজের জন্য দাঁড়াও, তোমাদের মুখ এবং কনুই পর্য্যন্ত হাত ধৌ, মাথা মুছিয়া ফেল, এবং পা গুড়ালি পর্য্যন্ত ধৌ” । বিশেষ অশুচি অবস্থায় স্নানের ব্যবস্থা, এবং জল না পাইলে, পরিষ্কার মাটিদ্বারা মুখ হাত মুছিবান ব্যবস্থা দিয়া, সেট সম্বন্ধে কোরাণে বলিতেছে :- “পরমেশ্বর তোমাদিগকে সঙ্কট ফেলিত ইচ্ছা করেন না, তিনি তোমাদিগকে শুদ্ধ করিতেই ইচ্ছা করেন, যেন তিনি তোমাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করিতে পারেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও” (মাউদাহ্ (৫) - ৬) । সামাজিক উপাসনা কালে যথাযোগ্য বেশভূষার ও উল্লেখ কোরাণে দৃষ্ট হয় :- “হে আদমের সন্তানগণ, প্রত্যেক উপাসনার সময়ে তোমাদের বেশভূষার প্রতি দৃষ্টি কর, এবং পানাহার কর, এবং সীমা অতিক্রম করিও না । নিশ্চয় তিনি সীমা অতিক্রমকারীদিগকে ভালবাসেন না ।” (আ'রাফ্ (৭) - ৩১) ।

উপাসনার সময় সম্বন্ধে কোন কোন স্থলে দেখা যায়, কোরাণে প্রাতঃকাল এবং সন্ধ্যাকালের উল্লেখ আছে :- “তোমার প্রভুকে বিনীতভাবে এবং ভয়ের সহিত নিজ মনে স্মরণ কর, প্রাতে এবং সন্ধ্যাকালে, অনুচ্চস্বরে, এবং অমনোযোগীদের মধ্যে হইও না” (আ'রাফ্ (৭) - ১-৫) । “যাহারা তাহাদের

প্রভুকে প্রাতঃসন্ধ্যা অর্পণ করে, এবং তাঁহার প্রসন্নতা কামনা করে, তাহাদের সঙ্গে তুমি তোমার প্রাণকে বন্ধ করিও,” কাহ্ফ (১৮)---২৮।

ইজরত মহম্মদের জীবিত কালেই যে ঈশ্বরোপাসনার জন্য অনেক মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাও জানা যায়। কারণ বলিতেছে :—“যে সকল গৃহকে পরমেশ্বর গৌরবাঙ্কিত করিতে অনুমতি দিয়াছেন, এবং যেন সে সকলের মধ্যে তাহারই নাম উচ্চারিত হয় ; তথায় তাহাকে প্রাতে এবং সন্ধ্যাকালে মহীয়ান্ করে, সে সকল লোক যাহাদিগকে বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় পরমেশ্বরের স্মরণ হইতে এবং উপাসনার প্রতিষ্ঠা হইতে, এবং জকাত দান হইতে বিমুখ করে না : তাহারা সেই দিনকে ভয় করে, যে দিনে হৃদয় সকল এবং চক্ষুসকল বিক্ষিপ্ত হইবে” (নূর (২৪)--- ৩৬, ৩৭)। “হে বিশ্বাসীগণ, পরমেশ্বরকে স্মরণ কর, পুনঃ পুনঃ স্মরণ কর, এবং প্রাতঃসন্ধ্যা তাহার মহিমা কীর্ত্তন কর” (তাহ্ জাব (৩৩)--- ৪১, ৪২ : ফৎহ (৪৮)---৮, ৯ ; কাফ (৫০)---৩৯, ৪০)।

কোরাণে ইহাও দেখা যায় যে মুস্লেমদিগকে কাফেরদের সঙ্গে মিলিয়া প্রনাশীবন্ধ সামাজিক উপাসনা করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। রাজা রামমোহনের নিকটে একালে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মূল তবে কি আমরা কোরাণেই পাইতেছি না ? কোরাণ বলিতেছে :—“যখন তুমি পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, তখন যদি আশঙ্কা কর, যে অবিশ্বাসীরা (কাফেরীনা)

উৎপাত করিবে, তখন যদি উপাসনার সময় সংক্ষেপ কর, তাহাতে তোমাদের দোষ হইবে না। নিশ্চয় অবিশ্বাসীরা (কাফেরীনা) তোমাদের স্পষ্ট শত্রু” (৪-১০১)। সেই সঙ্গেই আবার অবিশ্বাসীদের ভয়ে উপাসনা বন্ধ না করিয়া, বরং কাফেরদের উপকারের জন্য, যথাযোগ্য সতর্কতার সহিত, তাহাদের লইয়া উপাসনা করিতে, কোরাণে বলা হইতেছে :—“এবং (হে মহম্মদ) যখন তুমি অবিশ্বাসীদের মধ্যে থাক, তখন তাহাদের উপকারের জন্য উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখিও, দেখিও তাহাদের একদল যেন তোমার সঙ্গে দণ্ডায়মান হয়, এবং দেখিও যেন তাহারা তাহাদের অন্ত গ্রহণ করে। পরে যখন তাহারা প্রণত হইয়াছে (সেজ্দা), তাহারা যেন তখন তোমাদের পশ্চাতে চলিয়া যায়, এবং তন্মুদল যাহারা উপাসনা করে নাও, তাহারা যেন অগ্রসর হয়, এবং তোমার সঙ্গে উপাসনা করে ; এবং তাহাদিগকে আপনাদিগের রক্ষার ব্যবস্থা করিতে এবং অন্ত্রধারণ করিতে দেওয়া কর্তব্য” (৪—১০২) হয়, একালের মুসলমানেরা হিন্দুর সঙ্গে মিলিয়া নমাজ পড়িবার কি কোন ব্যবস্থা করিতেছেন ? তবে যাহারা নিজেরাই নমাজের অর্থ বুঝে না, তাহাদের নিকটে ঠহা আশা করা ও ছুরাশা। পরিশেষে এই সঙ্গেই বলা হইতেছে :—“যখন তোমাদের উপাসনা শেষ হইয়াছে, দাঁড়াইয়া, বসিয়া, অথবা দেহপার্শ্বে হেলান দিয়া, পরমেশ্বরকে স্মরণ করিও। কিন্তু যখন তোমরা ভয়মুক্ত হও, উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখ। নিশ্চয় উপাসনা সময়বাকী আদেশ” (নিসা (৪)— ১০২, ১০৩)।

উপাসনার সময় সম্বন্ধে আবার কোন কোন স্থলে বলা হইতেছে, “দিনের দুইভাগে এবং রাত্রির প্রথম ঘণ্টা সকালে, উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখ” হুদ (১১)—১১৪)। আবার উপাসনার সময় সম্বন্ধে বলা হইতেছে :—“উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, সূর্যের অন্তরোহণ হইতে রাত্রির অন্ধকার পর্য্যন্ত, এবং প্রাতের স্তোত্রপাঠ পর্য্যন্ত। নিশ্চয় প্রাতের স্তোত্রপাঠ সকালেই দেখিতে পায়। এবং রাত্রির কতকঅংশের জন্য উপাসনাদ্বারা নিদ্রা পরিত্যাগ কর, যাহা তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত”। উপাসনার স্বর সম্বন্ধে কোরাণ বলিতেছে :—“বল, আল্লাকে ডাক, বা দয়াময়কে ডাক, যে নামেই তুমি ডাক, উত্তম নাম সকল তাঁহারই, আর অতি উচ্চঃস্বরে উপাসনা করিও না : আবার সে সম্বন্ধে নীরব ও হঠাৎ না : এ উভয়ের মাঝামাঝি পথ অনুসন্ধান কর” (বনিইস্রাইল (১৭)—৭৮, ৭৯, ১১০) ।

আবার কোরাণ উপাসনার সময় সম্বন্ধে বলিতেছে :— “ধৈর্যের সহিত সহ্য কর, তাহার যাহা বলে : এবং তোমার প্রভুকে মহিমাম্বিত কর, সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তাহার মহিমা কীর্তনদ্বারা, এবং রাত্রিরও কতক অংশ : এবং দিবারও কতক অংশ, তাঁহার মহিমা ঘোষণা কর, যেন তুমি পরম সুখী হও”। তাহা (২০)—১৩০

“এবং তুমি তোমার প্রভুর বিচারের জন্য ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা কর, কারণ নিশ্চয় তুমি আমার চক্ষুর সমক্ষে আছ, এবং যখন তুমি উঠ, তোমার প্রভুর মহিমা কীর্তন কর। এবং

রাত্রিতে ও তাহাকে মহিমাষিত করিও, এবং যখন নক্ষত্রগুলি
অস্ত যায়” (তুর (৫২)—৩৮,৪৯) ।

“এহে কাম্বে আচ্ছাদিত ব্যক্তি, অল্পক্ষণ ব্যতীত, রাত্রিতে
উপাসনা করিতে দাঁড়াও । তাহার অঙ্কিত, অথবা কিছু কম
কর । অথবা তাহা বারিও, এবং পূর্বাপর ধারাবদ্ধ কারণ
পাঠ কর । নিশ্চয় আমি তোমার উপর গুরুতর বাক্য সকল
অবতীর্ণ করিব । নিশ্চয় রাত্রিতে উপাসনার জন্ম টুঠাই
দৃঢ়তর পথ, এবং ভাষা সংযত করিবার উপায় । নিশ্চয়
দিবাভাগে তোমার অনেক কাব্য । এবং তোমার প্রভুর নাম
স্মরণ কর, এবং ভক্তির সহিত আপনাকে তাহার প্রতি সমর্পণ
কর । তিনি পূর্ব পশ্চিমের প্রভু, তিনি ভিন্ন উপাস্ত্র নাই ।
অতএব তাহাকেই রক্ষক বলিয়া গ্রহণ কর” (মুজাম্মিল (৭৩)—
১ হইতে ৯) । “এবং তোমার প্রভুর নাম প্রাতে এবং সায়াহু-
মহীয়ান্ কর । এবং রাত্রির কতক অংশ তাহার অর্চনা কর,
এবং তাহাকে মহীয়ান্ কর- -রাত্রির অনেক অংশ” (ইন্সান
(৭৬)—২৫,২৬) । একালের প্রচলিত বান্ধাধরা ঠিক পাঁচাবলা
নামাজের কথা কোরাণে পাইতেছি না ।

জুম্মা বা শুক্রবারের উপাসনার বিশেষ উল্লেখও আমরা
কোরাণে দেখিতে পাই । কোরাণ বলিতেছে :—“হে বিশ্বাসীগণ
শুক্রবারে যখন উপাসনার জন্ম আহ্বান করা হয়, তখন
পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতে সত্বর হও, এবং ব্যবসায় বন্ধ কর ;
তাহাষ্ট তোমার পক্ষ অধিক কল্যাণকর, যদি তুমি বুঝ ।

কিন্তু যখন উপাসনা শেষ হয়, তখন স্থানে স্থানে ছড়াইয়া পর, এবং পরমেশ্বরের অনুগ্রহের অনুসন্ধান কর, এবং পরমেশ্বরকে আর বার স্মরণ কর, যেন তোমরা কৃতকার্য হও। এবং যখন তাহার বিক্রির মাল, অথবা আমোদ সম্মুখে দেখে, তাহার ত্রাহার দিক চলিয়া যায়, এবং তোমাকে দণ্ডায়মান রাখে। বল, যাহা পরমেশ্বরের নিকটে আছে, তাহা আমোদ অথবা বিক্রির মাল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এবং পালনকর্তাদের মধ্যে পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ। জুমু'আত্ (৬২) ৯ হুটতে ১১)। পাঠক বিশেষরূপে লক্ষ্য করুন—কোরাণ বারবার বলিতেছে, “ইনকুন্তুম্ তা'লামুনা,” “যদি তোমরা বুঝ”। নমাজ বা উপাসনা বা কোরাণ পাঠ সম্বন্ধে বুঝিয়া শুভিয়া সকল কার্য করাই কোরাণের অভিপ্রায়। তাহার পরিবর্তে এ কালের, এদেশের মুসলমান-সাধারণ কি করিতেছে তৎপ্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহারাষ্ট বিচার করুন, তাহারা কিরূপ মুসলমান, কাণাঃঃলের পদ্মঃলাচঃ নামের মত তাহাদের ‘মুসলমান’ নাম কি না।

কোরাণে বিশ্বাসীদিগকে মহম্মদের উপরে ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করার জন্ত উপদেশ আছে “ইয়া আ-ইয়ুহা-লাঈনা আমানু সাল্লু আলাইহে ওআ-সাল্লেমু তাসূলীমান্” (আহজাব (৩৩) -৫৬) “হে বিশ্বাসীগণ, তাহার জন্ত (ঈশ্বরের) আশীর্বাদ প্রার্থনা কর এবং যথাযোগ্য রূপে তাহাকে সেলাম কর”।

আর একটি বিশেষ কথা এই যে কোরাণ অশ্রান্ত সম্প্রদায়ের ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন,— যাহা আজকালের অন্ততঃ বঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। কোরাণ বলিতেছে :—“প্রত্যেক জাতির জন্য আমি ধর্ম অনুষ্ঠানের প্রণালী নির্দেশ করিয়াছি, যেন তাহারা তাহার অনুষ্ঠান করে। অতএব এ বিষয়ে তোমার সহিত তাহাদের বিবাদ করা উচিত নয়। এবং তুমি তোমার প্রভুকে ডাকিতে থাক। নিশ্চয় তুমি ঠিক পথে আছ”। হুজ্ (২২) - ৬৭ *

* যাহারা কোরাণের ‘সালাত’ সম্বন্ধে অধিক জাণিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা নিম্ন-প্রদর্শিত সূরা ও আয়াত দেখিবেন :—ফাতেহা (১)— ১ হইতে ৭। বকরাহ (২)—২৬৮, ২৩৯। ইমরান (৩)—১৯০। নিসা (৪)—৪৩, ১০১ হইতে ১০৩। এনাম (৬)—৫২। এরাক (৭)—৩১, ১৮০, ২০৫, ২০৬। হুদ (১১)—১১৪। বণি ইস্রাইল (১৭)—৭৮, ৭৯, ১০৬ হইতে ১১১। কহ্ফ (১৮)—২৮। তাহা (২০)—১৩০। হুজ্ (২২)—৭৭। সূর্ (২৪)—৪১। ফোরকান (২৫)—৫৮, ৬৩, ৬৪। অনকবুত (২৯)—৪৫। রুম (৩০)—১৭, ১৮, ২৯ হইতে ৩৩। সেজ্দা (৩২)—১৫, ১৬, ১৭। আহ্ জাব (৩৩)—৩, ৪১, ৪২, ৪৩। জোমর (৩৯)— ২। যুমেন (৪০)—৭, ১৪, ১৫, ৫৫, ৬০। হামিম (৪১)—৩৩। ফহ্ (৪৮)—৮, ৯। কা (৫০)—৩৯, ৪০। তুর্ (৫২)—৪৮, ৪৫। জুমু-আ (৬২)—৯, ১০, ১১। মেরাজ (৭০)—১৯ হইতে ২৫, ৩২ হইতে ৩৫। জেন্ (৭২)—১৮ হইতে ২২। যুমেন্ন (২৩)—১ হইতে ১১, ২৬, ২৭, ২৮। দহর (৭৬)—২৫, ২৬। আলা (৮৭)—১ হইতে ৭, ১৪।

কোরাণে বিশুদ্ধ উপজীবিকা ; 'রেবা' বা সুদখুরী নিষেধ ।

হিন্দু বৈদিক ঈশ্বর উপাসককে বারবার শুদ্ধচিত্ত হইতে বলিতেছে, “শুদ্ধাঃ পূতা ভবত” (ঋ. ১০-১৮-২) । উপনিষদে বৈদিক প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছে, “শুদ্ধঃ পূতঃ পুণ্যালোকো ভবতি” (ছা. ৫-১০-১০), “যে শুদ্ধ হয়, পবিত্র হয়, সে পুণ্যালোক অধিকার করে,” “যথোদক শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি । এবং মুনেৰ্বিজ্ঞানত আত্মা ভবতি গৌতম” (কঠ ১-৪-১৫) । “হে গৌতম, শুদ্ধ জল শুদ্ধ জলে পরিলে যেমন হয়, জ্ঞানবান্ মুনির আত্মাও সেরূপ হয় ।” কোরাণ ও মুসলেমকে শুদ্ধচিত্ত হইতে বলিতেছে, “ও-আ আল্লাহ্ ইব্রুহিবুল্ মুস্তাহীরিনা” (তাওবা, (৯)---১০৮), “পরমেশ্বর তাহাদিগকে ভালবাসেন, যাহারা আপনাদিগকে পবিত্র করে” । বৈদিক ঋষিগণ জানিতেন, যে অন্নশুদ্ধি ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি লাভ হয় না । তাই ঋষি কুর্শ্ব পরের পরিশ্রমের ফলভোগ করাকে পাপ মনে করিয়া, পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন, “মাহং রাজস্বকৃতেন ভোজং” (ঋ. ১-২৮-২), “হে বিশ্বরাজ, আমি যেন পরের পরিশ্রমের ফল ভোগ না করি” ।* এজন্য বেদের ঋষিগণ

* শরীরের বাহ্য পবিত্রতা সম্বন্ধে ও কোরাণের এবং বেদের সমান মনোযোগ দৃষ্ট হয় । কোরাণ বলিতেছে—“হে বিশ্বাসীগণ, যখন তোমরা উপাসনা করিতে দাঁড়াও, তোমাদের মুখ এবং হাত কিছুই পর্যাস্ত ধো,

নিজ হাতে হল চালনা করিতেন। “সীরা যুগ্মস্থি কবয়ো” (ঋ, ১০-১০১-৪), এবং লোকসকলকে হল চালনা করিতে উপদেশ দিতেন. “কৃষিমিৎ কৃষম্ব” (ঋ, ১০-৩৪-১৩) । হায়, এ কালের হিন্দু কি না জমিদারী করিয়া, রায়ভেদ পরিশ্রমের ফল ভোগ করিয়া, কিম্বা মহাজনি করিয়া খাতকের পরিশ্রমের ফল ভোগ করিয়া, কিম্বা একালতি কি চাকরী করিয়া মকলের পরিশ্রমের ফলভোগ করিয়া, আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিতেছে। লোক দেখান, এক প্রকার বাহ্য শুদ্ধি-সংগঠন অবলম্বনে ‘হিন্দুধর্মের জয়’ হউল, মনে করিতেছে। প্রকৃত চিত্তশুদ্ধি এবং অন্নশুদ্ধি সম্বন্ধে এ কালের হিন্দু-মুসলমান উভয়েই নীরব। বেদের মত কোরাণ ও অন্নশুদ্ধিকে চিত্তশুদ্ধির মূল জানিয়া,

এবং মাণ্য মর্চিয়া ফল, এবং গোডালি পরীক্ষা পা দৌ; এবং যদি স্নান করা গোমার কৃত্ত দর্শিতম, কবে স্নান কর”। (সুরা মাত্‌দা ৫ - ৬)

শাখরও বর্ণিত আছে ‘আপা অস্মান্ গাতবঃ শুক্লয়ঙ্ঘ স্বপোন নো স্বতপুঃ পুনম্। তিস্মা হি তিপ্পং কুবহুর্ক্ট দেবীকামিনাভাঃ শুচিতা পত্ গমি ॥ ১০-১৭ ১০ ॥ স্মি দেবশ্রবা সতস্বতী নদীতে স্নান করিয়া গাঁলেহেচেন—

“ভলে প্রকাশমান ভগবতের গাত্ত্বরূপ ঈশ্বরের মতিগা আমাদি কে শুদ্ধ করুন। তিনি জলদ্বারা শুদ্ধ করেন (স্বতপুঃ)। তিনি জলদ্বারা আমাদিগকে শুদ্ধ করুন। ভলে প্রকাশিত ঈশ্বর মতিগা (দেবীঃ) সকল গলিনতা দূর করেন, তাই শুদ্ধ হউয় পবিত্র হউয়া, এই জল হইতে আমি গামিতেছি”। আচার্য্য কেশবচন্দ্র তাঁহার নবসংহিতাতে স্নানকালে এষ্ট বৈদ্য গঙ্গনী স্মরণ করিতে সলিহেচেন। (গুহ—১২)।

মুসলমানকে উপদেশ করিতেছে, “আনফকু মিন্ তায়িবাতে মা
কাসাব্ তুন্ ৫-আ মম্মা আখরাজ্ না লাকুম্ শ্বিনাল্ আর্দে”
বকরত (২) ১৬৭, “তোমাদের যে ধন বিপুল উপায়ে
অর্জিত, সে আমি তোমাদের জন্য ক্ষেত্র হইতে যাহা উৎপাদন
করিয়াছি, তাহা হইতে বায় কর”। বেদ যেমন বৈদিক কালের
উপযোগী কৃষি চাষা করিয়া, জীবিকা উপার্জন করিতে লোককে
বলিতেছে, কারণ ৫ সঠিক কারণের সময়ের উপযোগী
শিল্প-বাণিজ্য এবং কৃষি করিয়া জীবিকা উপার্জন করিতে
মুসলমানকে উপদেশ দিতেছে।

সাধানগ ভাবে মনু বলিতেছে, যে স্ত্রদের বন্ধি মূলের
দ্বিগুণের বেশী হইবে না, “কুসীদবন্ধি শ্বেগুণাং নাত্যতি,”
৮-১৫১। কিন্তু এ কালের হিন্দু সে কথাতে কর্ণপাত ও
করেন না। অপরদিকে কারণ সূদখারীর বিরুদ্ধে অথবা
সূদখা ওয়াইয়া সূদখারের উদর পূরণ করার বিরুদ্ধে যে তীব্র
প্রতিবাদ করিতেছে, তাহাকেই এদেশের হিন্দু-মুসলমান উভয়ের
বর্তমান দরিদ্রতা-রোগের আঘাত ঔষধ জানিয়া, আমরা তৎপ্রতি
হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।
ইহা সকলেই জানেন, যে বাঙ্গলা দেশের, অস্তিতঃ পূর্ববঙ্গের
মুসলমানেরাষ্ট প্রধানত কৃষি মজুরি প্রভৃতি যাবতীয় পরিশ্রমের
কার্য্য করিয়া, সাক্ষাৎভাবে দেশে অন্ন এবং অর্থ উৎপন্ন করিয়া
থাকে। কিন্তু হায়, মুসলমানের নির্কৃদ্ধিতা হেতুই হউক, আর
যে কারণেই হউক, সে অন্ন, সে অর্থ ভোগ করা মুসলমানের

ভাগ্যে কমই ঘটে : তাহাদের উৎপন্ন সেই দ্রব্য এবং সেই অর্থ, মোকদ্দমা এবং মহাজ্ঞানীর পাপ, অলক্ষিত ভাৱন গিয়া হিন্দু উকীল ও হিন্দু মহাজ্ঞানের উদর পূরণ করে। এইরূপ বেদ-বিরুদ্ধ অহিন্দু উপায়ে অলসভাবে জীবিকা উপার্জন করিয়া, হিন্দু আধাগতি প্রাপ্ত হইতেছে। এবং মুসলমান নিয়ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরিশ্রম করিয়াও অধিকাংশ অথবা চুরিদারি করিয়া জেলে গিয়া দিন কাটাতেছে। হিন্দুও অর্থ কিং অল্প উৎপাদনের জন্য “বানিজ্য বসন্তে লক্ষ্মী তদক্ষ-কৃষিকর্মণি” এই অমোঘ মন্ত্র ভুলিয়া শিল্পবানিজ্যাদির বিক্যাশত দিকে মনোযোগ না দিয়া, দিন দিন পঙ্গু হইতেছে। এ দুরাবস্থার প্রতিকার না করিলে, হিন্দু-মুসলমান উভয়ের বিনাশ নিশ্চিত।

আদালতে না গিয়া, কোরানের উপদেশ মত আপোষদ্বারা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলে, দরিদ্র মুসলমান বাঁচবে, নতুবা মরিবে। সে সম্বন্ধে কোরাণে যাহা আছে, তাহা আমরা পূর্বেই পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছি (পৃ: ৩৬ হইতে ৪১)। এস্থলে জকাত বা দান ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠাদ্বারা ঋণজড়িত দরিদ্র মুসলমানকে হিন্দু মহাজ্ঞানের করালগ্রাস হইতে মুক্তি করা বিষয়ে কোরাণে যাহা বলিতেছে, তৎপ্রতি আমরা হিন্দু-মুসলমান উভয়ের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। কোরাণে বলিতেছে :—“যাহারা স্ত্রী খায়, তাহারা সোজাভাবে মানুষের মত দাঁড়াইতে পারে না,—যে লোককে শয়তান তাহার

স্পর্শদ্বারা ধরাশায়ী করিয়াছে, সে লোক যেমন দাঁড়ায়, সেরূপ ভিন্ন। ইহার কারণ এই, যে তাহারা বলে যে শিল্প-বাণিজ্য সুদখারীর মত হইবে। অথচ পরমেশ্বর লোককে শিল্প-বাণিজ্য করিতে আদেশ করিয়াছেন, এবং সুদখারী করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যে লোকের প্রতি তাহার প্রভু হইতে এই আদেশ আসিয়াছে, সে যদি আদেশ পাঠিয়া সুদখারী হইতে বিরত হয়, তবে আদেশ পাঠনার পূর্বে যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা সে পাইবে। এবং সে লোকের কার্যভার পরমেশ্বরের হাতে আছে। এবং যে কেহ আদেশ লাভের পর আবারও সুদখারী করে, সেরূপ লোকেরা নরকাগ্নির নিবাসী : তথায় তাহারা থাকিবে। পরমেশ্বর সুদখারী অনুমোদন করেন না : এবং তিনি দণ্ডের কারণে (সাক্ষাৎ) উন্নতি বিধান করেন : এবং পরমেশ্বর কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না। নিশ্চয় যাহারা ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাস করে, এবং সংকল্প করে, এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে, এবং দরিদ্রের সাহায্য অর্থদান করে (ভূকাং), তাহারা তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে তাহাদের প্রাপ্য পুরস্কার পাইবে, এবং তাহাদের কোন ভয়ের কারণ থাকিবে না, এবং তাহারা বিপদগ্রস্ত হইবে না। হে বিশ্বাসীগণ, পরমেশ্বরকে ভয় কর, এবং সুদের যাহা বাকী আছে, তাহা মাপ কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। যদি তোমরা তাহা না কর, তবে জানিও পরমেশ্বর এবং তাঁহার প্রেরিতের সহিত তোমাদের যুদ্ধঘোষণা। যদি তুমি অনুতপ্ত হও, তবে তোমার

মূলধন ভূমি পাঠ্যেব । খাতককে ভূমি ক্ষতিগ্রস্ত করিতে
পারিবে না । এবং তোমাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করা হইবে না ।
খাতক যদি ভ্রাতৃস্বাপন্ন হয়, তবে তাৎক্ষণিক কর, গতদিন না তাহার
অবস্থা ভাল হইয়াছে । এবং ভূমি যদি দানস্বরূপে তাহা মাপ
কর, তবে তোমার পক্ষে ভাল, যদি ভূমি বৃদ্ধিতে । বকরাহ্
(২)—১৭৫ হইতে ১৮০ * । অবার কোথাও বলিতেছে :—

* আল্লাজীনা ইয়া'কুলুনার্ বেবা না ইয়াকুম্না ইল্লা কান্না ইয়াকুম্ন
ল্লাজী ইয়াতাখাত্তাহাশ্শাইহানে। মনাল্ মাস্নৌ : জালেকা নে
আল্লাহম্ কানু ইয়াগাল্ বাই-উ মেসলুর্ বেবা । ও-আ আশাল্লা লাহল্
বাই-আ ও-আ হার্বুমার্ বেবা । কানান্ জা-আ-হ মাউ-ই-জাতুন্ মিন্
বাক্বিহি কান্তাহা কালাহ্ মা নালাক । ও-আ আমরুহ ইলা লাহে ।
ও-আ মান্ আদা ফা উলায়েকা আম্হাব্ মারে । হম্ কীহা গালেতনা ।

ইয়াম্হাক লাহর্ বেবা ও-আ ইয়ুনীস্ সাদাকাতে । ও-আ লাহ লাহ
ইউহিন্ কুল্লা কাক্ ফারিন্ আসীমিন্ ।

ইয়া ল্লাজীনা আনামু ও-আ আনেলুন্ সালেহাতে ও-আ আকামুস্ সালাতা
ও-আ আতা-উ জাকাতা লাহম্ আজ্জহম্ এননা বাক্বিহিম্ । ও-আ না
খাওকুন্ আলাইহিম্ ও-আ লা হম্ ইয়াহ্ জামুন ।

ইয়া আইয়ুহা ল্লাজীনা আনামু তাক্ লাহা ও-আ জাক না বাক্বীয়া
মিনার্ বেবা ইন্ কুহম্ মুগেনীনা ।

ফা ইন্ লাম্ তাকআলু কা' জামু বেহার্বিন্ মিনা লাহে ও-আ
রাসুলেহি । ও-আ ইন্ তুহ্ তুন্ কালাকুম্ ক-উ-সু আম্-ও-আলেকুম্ ।
লা তাহ্ সেমুন । ও-আ লা তুজ্ লামুন ।

ও-আ ইন্ কানা জু' উন্নাতিন্ কা নাজ্জেরাতুন্ ইলা মাইসারাতিন্ ।
ও-আ আনু তামাদাকু পায়কুন্ লাকুম্ ইন্ কুহম্ তা'লামুন ।

সুরা বকরাহ্ (২)—১৭৫ হইতে ১৮০ অবারত ।

“তে বিশ্বাসীগণ, সুদ খাইও না, তদ্বারা পুনঃপুনঃ অর্থরক্ষি করিও না। এবং পরমেশ্বরকে ভয় কর, যেন তোমরা কৃতকার্য হও” (ইমরান্ (৩)—১২৯) † । আবার কোরাণ বলিতেছে :— “এবং তোমরা সুদখুরীতে যাহা লাগাও, যেন তাহা মানুষের সম্পত্তিরূপে রক্ষি পায়, আল্লাহর নিকটে তাহা রক্ষি পাইবে না। আর পরমেশ্বরের সন্তোষের জন্য তোমরা দরিজের উপকারার্থে দানরূপে (জকাৎ) যাহা লাগাও, এইরূপ লোকই অনেক লাভবান্ হইবে” (রুম্ (৩০)—৩৯ § ।

“পরমেশ্বর শিল্পবানিজ্যকে বৈধ করিয়াছেন, এবং সুদখুরীকে অবৈধ করিয়াছেন,”—কোরাণ একথা বলার কি কারণ হইতে পারে, হিন্দুমুসলমান উভয়েই চিন্তা করুন। শ্যাইলকের (Shylock) গল্প হয়ত তাহারা শুনিয়াছেন। সুদখুরের লক্ষ্য গরীবকে রক্ষা করা নয়, গরীব খাতকের সম্পত্তি গ্রাস করা, এবং বিনা পরিশ্রমে তাহা ভোগ করা। খাতক কপর্দকশূণ্য হইয়া সপরিবারে পথের ভিখারী হইক, তাহাতে সুদখুরের কি দুঃখ ?

+ ইয়া অ-ইয়াহা মাজীন। আমানু লা তা'কুলুর্ রেবা আজ্ আফান্ সুজ্-আফাতান্ । ও-আতাকু মাহা লা আলাকুম্ তুফ্ লেহনা । সুরা ইমরান (৩)—১২৯ আয়াত ।

§ ও-আ মা আতাইতুম্ সিন্ রেবান্ রে ইয়াবু আ কী আম্-ও-আলে মাসে ফাঃ ইয়াবু এন্দালাহে । ও-আ মা আতাইতুম্ সিন্ জাকাতিন্ তুরিহনা ও-আজ্ হা মাহে ফা উলায়েকা হমুল্ মুজ্-এ-কুনা । সুরা রুম (৩০)—৩৯ আয়াত ।

নিষ্ঠুরভাবে বিনা পরিশ্রমে গরীবের রক্ত খাইতে ২ সুদখুরের মনুষ্য লোপ পায়, দয়ারক্তি রুদ্ধ হয়। সে স্বার্থীক হয়, অলস হয়, মিথ্যাচারী মামলাবাজ উকিলের দাস হয়, এবং নীতিবিহীন হয়। তাই কোরাণ বলিতেছে, যে প্রকৃত মুস্লেমের পক্ষে সুদ খাওয়া 'হারাম'। মুস্লেমের পক্ষে সুদ দিয়া সুদখোর প্রায় দেওয়াও 'হারাম'। মুস্লেম সুদ নিতেও পারে না, দিতেও পারে না।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য যখন প্রকৃত মুস্লেমের জন্ম বৈধ, এবং সে জন্ম তিনেরই মূলধনের প্রয়োজন, তখন সে জন্ম মূলধন পাঠিতে হইলে, মুস্লেমকে কি করিতে হইবে? কে না জানে, যে বিনা মূলধনে কৃষি, কি তেজারতি চলে না? যদি সুদ দিয়া ধার করা অবৈধ হইল, তবে কৃষি এবং তেজারতির জন্ম মুস্লেম মূলধন কোথায় পাইবে? আবার একথাও সত্য যে, যে স্থলে সভ্যদেশে শতকরা চারআনা কি ছয় আনা মাসিক সুদ দিয়া সহজেই কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের জন্ম লোকে সরকার হইতে কি বেঙ্ক হইতে টাকা ধার পায়, সে স্থলে এ হতভাগ্য দেশে সুদখোর মহাজনকে মাসিক শতকরা ৬০ টাকা সুদ দিয়া, সুদের সুদ দিয়া, হিন্দু-মুসলমানকে মূলধন ধার করিয়া, কৃষি অথবা তেজারতি করিতে হয়। সকলেই জানে, এত সুদ দিয়া, মূলধন ধার করিয়া, কৃষি কি শিল্প বাণিজ্য করিয়া, লাভবান হওয়া অসম্ভব।

এইরূপ ভীষণ সঙ্কটের অবস্থায়, ইমানদার মোস্লেমের কোরাণ যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তৎপ্রতি আমরা

হিন্দু-মুসলমান উভয়ের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি । কোরাণ বলিতেছে :—“এবং তাহারা (মুসলেমেরা বা ঈশ্বরের নির্ভরকারীরা) পরমেশ্বরের দাসত্ব করা, সরল প্রাণে পরমেশ্বরের অধীন হওয়া, সতানিষ্ঠ হওয়া, এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত করা, এবং দরিদ্রের হিতার্থে অর্থদান করা (জকাৎ), ইহা ভিন্ন অণ্ডকিছু করিতে বাধা নয় । ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম” (সূরা বায়্যিনাহ্ (৯৮-৫) † । কোরাণ পুনঃপুনঃ দরিদ্রের হিতার্থে দান বা জকাৎকে উপাসনা বা সালাতের সহিত এক পর্যায়ে ভুক্ত করিয়া, ইহাই দেখাই-তেছেন যে, যে ব্যক্তি দরিদ্রের জন্য অর্থদান না করে, তাহার উপাসনা গৃহীত হয় না । প্রত্যেক মুসলেমকে আপন অবস্থানুসারে দান (জকাৎ) করিতে হইবে । যাহার অনেক আছে সে অনেক দিবে, যাহার অল্প আছে, সে অল্প দিবে (“The widow’s mite”) । কোরাণ সূরা তালাকে বলিতেছে, “যাহার প্রচুর ধনসম্পত্তি আছে, সে সেই প্রচুরতা হইতে, এবং যাহার জীবিকার উপায় সংকীর্ণ, সে ঈশ্বর তাহাকে যাহা দিয়াছেন, সেট (সংকীর্ণতা) হইতে, (দানার্থ) অর্থব্যবহার করিবে । পরমেশ্বর কোন ব্যক্তির উপরে এমন বোঝা চাপান না, যতদূর শক্তি তিনি দিয়াছেন, তাহার অধিক । সংকীর্ণতার পর

† “ও-আ না উমেরু ইল্লা লে ইয়াবুহু লাহা মুখ্লেসোনা লাহু দীনা, হানাফা-আ ও-আ ইয়ুকিমুস্ সালাতা ও-আ ইয়ুতু জ্জাকাতা ও-আ জালেকা দীনোল্ কারিয়াগাতে ॥” সূরা বায়্যিনাহ্ (৯৮)-৫ ॥

পরমেশ্বর প্রচুরতা আনয়ন করেন” (৬৫-৭) * । আরার সুরা ইনসান বা দহরে (৭৬) ধার্মিকদিগের (“আবুরা”) সম্বন্ধে কোরাণ বলিতেছে—“এবং তাহারা ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা হেতু দরিদ্রকে, অনাথকে, এবং বন্দীকে অন্ন দেয় : (এবং বলে যে) কেবল পরমেশ্বরের উন্মুখ আমরা তোমাদিগকে আহ্বান দেই : আমরা তোমাদের নিকট হইতে কোন প্রতিদান অথবা কৃতজ্ঞতা উচ্ছা করি না.” ইনসান (৭৬)-৮,৯ ৭ ।

পাঠক দেখিতেছেন, কোরাণের বিধি পালন করিয়া প্রকৃত মুসলমান হইতে হইলে, প্রত্যেক মুসলমান-মণ্ডলীর একটা দানভাণ্ডার বা জকাতের তহবিল থাকিতে হইবে । হতভাগা বঙ্গীয় মুসলমানদের কি সেট তহবিল আছে ? থাকিলে, নিশ্চয়ই দরিদ্র শ্রমজীবী ও কৃষক মুসলমানেরা সুদখার সাতা প্রভৃতি নানা শ্রেণীর হিন্দুর মুখের গ্রাস হইত না ! এখন কি তবে মুসলমানগণ তাহাদের সেট জকাতের তহবিল পুনঃ প্রতিষ্ঠিত

* “লে ইয়ুন্কেক জু সা-আ-হিন্ ঈন্ সা-আ-হেগি । ও-আ মান্ কুদেরা আ-লাইহে রেজ্ কুহো ফাল্ ইয়ুন্কেক মেয়া আতাগো লাহে । লা ইয়ুকালেফু লাহো নফসান্ ইল্লা মা আ-গাথা । সাইয়াজ্-আলু লাহো বা'দা উস্‌রিন্ ইয়ুস্‌রান্” (হালাক (৬৫)—৭) ।

† ও-আ ইয়ুং-ইমুনা তা-আনা আলা হুসেগি মিস্কিনান্ ও-আ ইন্নাতীমান্ ও-আ আসীরান্ । ইন্নামা হুং-এমু কুম্ লে ও-আজ্ হে লাহে । লা হুরীদো মিন্ কুম্ জাহ্-আন্ ও-আ লা' ওকুরান্” । সুরা ইনসান্ বা দহ্‌র (৭৬)—আয়াত ৮,৯ ॥

করিতে প্রাণপণ যত্ন করিবেন না ? সেই জকাতের অর্থের ব্যবহার সম্বন্ধে কোরাণ কি বলিতেছে ? সেই জকাতের অর্থ যে যে কারো নানকৃত হউন, তৎসম্বন্ধে কোরাণের যে ব্যবস্থা আছে, তৎপ্রতি ও আমরা হিন্দু মুসলমান উভয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি ।

কোরাণ বলিতেছে :- “দানের অর্থ কেবল গরীব ও অভাবগ্রাস্তের জন্য ও তৎসংক্রান্ত কর্মচারীদের জন্য, ও যাহাদের অমূল্য ঈসলামের দিকে অনুরক্ত কবা হইতেছে, তাহাদের জন্য, দাসদের গ্রীবা মুক্তির জন্য, যাহারা ঈশ্বরোপাস্ত তাহাদের সাহায্যের জন্য, এবং ঈশ্বরের পথে ব্যয়ের জন্য, এবং পথিকদের সাহায্যের জন্য । ইহা ঈশ্বরের একটি আদেশ, এবং ঈশ্বরের স্তোত্র এবং স্মৃতিপুণ (সূরা বরা'আত (৯)-৬০)*

কি আশ্চর্য্য ! সূরা বরা'আতের উক্ত আয়াতের মর্ম্মানুসারে ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কোরাণের সময়ে মুসলিমদের মধ্যে জকাতের ধনের একটা পৃথক্ বিভাগ ছিল । তাহার পৃথক্ কর্মচারী ও ছিল । ইমান্দার দরিদ্রের সাহায্যার্থ সাধানুসারে অর্থদান করা, উপাসনার শ্রায়, সকল মুসলিমের

* ইরামা সুসাদাকাতে লিল্ ফুকারা-এ ও-আল্ মাসাকীনে ও-আল্ আমেলিনা আলাইহা ও-আল্ মু-আল্লাফাতে কুলুবুহুম্ ও-আ ফী বেরকাবে ও-আল্ গারেমীন। ও-আ ফী সাবিলে লাহে ও-আব্নী সুসাবীলে । ফারী-জাতান্ মিনাল্লাহে । ও-আল্লাহো আলীমূন্ হাকিমূন্ । সূরা বরা'আত বা তাউবা (৯)—৬০ আয়াত ।

নিত্য কর্ম ছিল। এখন তাহা কে ? ভাটি মুসলমান. তোমরা কি কোরাণের এই বহুমূল্য ব্যবস্থাকে শিরোধার্য করিয়া, সেই পুরাতন জকাতের ধনভাণ্ডারকে এ কালোচিত সংগঠন (organisation) প্রদান করিয়া, আত্মরক্ষা এবং ইমান্দার মুসলেমের রক্ষার উদ্দেশ্যে পুনর্জীবিত করিবে না ? সভ্যদেশ সকলের মত জকাতের উপরে চরিত্রমূলক দরিদ্র-ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিয়া (Raiffeisen Village Banks, and Casa Rurali" based on "capitalised honesty"), তোমরা কি ইমানদার প্রকৃত মুসলমানদিগকে সুদখোরের উদর পূরণ করিয়া, কাফেরির সাহায্য করিয়া, নরক গমন হইতে বাঁচাইবে না ? অর্ধেক নৌকা অর্ধেক কুমীর হয় না। জানিতে হইলে, ষোল আনা কোরাণকেই জানিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে এক একটি জকাতের বিভাগ খুলিয়া, সভ্যদেশ সকলের মত তোমরাও যাহাতে প্রত্যেক ইমানদার মুসলমানকে, শুধু তাহার ইমানের উপরে ("capitalised honesty") বিনা সুদে, বিনা বন্ধকে, বিনা তমসুকে, যথাযোগ্য অর্থদান করিয়া ঋণমুক্ত করিতে পার, তাহার বন্দোবস্ত তোমাদিগকে করিতে হইবে। এসম্বন্ধে পাঠক আমাদের কৃত "চরিত্র-মূলক যৌথ-দরিদ্র ধনভাণ্ডার" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকা দেখিবেন। জানিও সভ্যদেশ সকলে লোভ এবং স্বার্থমূলক ব্যক্তিগত মহাজনি বা শাইলক্-গিরি প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। তাহার স্থলে তেজারতির (Industries & Commerce) সাহায্যকে একমাত্র লক্ষ্য

করিয়া, সমবায় প্রণালীতে ধনভাণ্ডার সকল (Co-operative Banks) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । তাহার ফলে, তোমরা যে স্থলে মাসিক শতকরা ৬০ সাড়ে ছয় টাকা সুদ দিয়া থাক, সুদের সুদ দিয়া থাক, পাশ্চাত্য শিল্পিগণ ও বণিকগণ বিনা বন্ধকে, কেবল সততার বলে (“capitalised honesty”) আমাদের চক্ষুর সমাক্ষ, এদেশে তাহার স্থলে মাত্র ১/০, ১৮/০ পাঁচ আনা ছয় আনা সুদ দিয়া, ইম্পিরিয়েল বেঙ্ক হইতে তাহাদের যাহার যত মূলধন প্রয়োজন, তাহা পাইতেছে । বস্তুতঃ এই শতকড়া পাঁচ আনা সুদদ্বারা আফিসের বায়াদির মাত্র সঙ্কলান হয়, প্রকৃত গরীবের রক্ত-শোষণকারী সুদখোরীর তাহাতে স্থানই নাষ্ট । বলিতে গেলে “হারামা রেবা,” সুদখুরী হারাম, কোরাণের এই অমূল্য উপদেশ পাশ্চাত্যরাই পালন করে : হিন্দু-মুসলমান সে উপদেশের দিকে দৃষ্টি করে না । যতক্ষণ না মুসলমান কোরাণের উপদেশ মত জ্বকাতের উপরে ‘চরিত্রমূলক যৌথ দরিদ্র-ধনভাণ্ডার, প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ইমানদার শিল্পী এবং বণিকদিগের জন্ম, পাশ্চাত্য উন্নত জাতি সকলের মত, বিনা সুদে (কিম্বা নাম মাত্র সুদে) তাহাদের মূলধন যোগাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে, ততদিন পাশ্চাত্য উন্নত জাতি সকলের সহিত শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে প্রতিযোগিতা, মুসলমানের পক্ষে অসম্ভব, শিল্প-বাণিজ্য করিয়া ধনী হওয়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব । যথার্থ্যাগঃ প্রকৃত উপায় অবলম্বন না করিলে, এই প্রতিযোগিতার দিনে হিন্দু-মুসলমানের পক্ষে শিল্প-বাণিজ্যে কৃতকার্য হওয়া অসম্ভব ।

ভাই মুসলমান, মামলাবাজ মুসলমান মোকদ্দমা যেমন কখনও তাহার হিন্দু উকীলের সমান হইতে পারে না, সেইরূপ মুসলমান যতদিন হিন্দুর খাতক থাকিবে, ততদিন সে তাহার হিন্দু মহাজনের সমান হইতে পারিবে না। মুসলমান যদি হিন্দুর সমান হইতে চায়, তবে একদিকে তাহাকে কোরাণের উপদেশ মত মোকদ্দমা বন্ধ করিতে হইবে, অপরদিকে কোরাণের উপদেশ মত জকাৎ-মূলক ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইমানদার মুসলমানের ইমানকে সুদখরির প্রশ্রয়দান (abatement of usury) হইতে বাঁচাইতে হইবে। ইমানদার নাছিয়া এইসকল জকাৎ-ভাণ্ডারের ভার তাহাদের উপর অর্পণ করিতে হইবে। যদি বেশী টাকা দিয়া বিশ্বাস করা যায়, এমন ইমানদার না মিলে, তবে যত ইচ্ছা অল্প টাকার উপরে ছোট ছোট অসংখ্য জকাৎ-ভাণ্ডার খুলিতে হইবে। তাহার জন্য উপযুক্ত ইমানদার লোক নিশ্চয় প্রতিগ্রামেই আছে। এই সকল ধন-ভাণ্ডার প্রত্যেক গ্রামে এক একটি টাকার গাছের মত হইবে। কারণ ইহাতে সকলেই দান করিবে, কিন্তু কেহ ভীত হইতে সুদ খাইবে না। যে সকল ইমানদার লোক এই সকল ভাণ্ডার হইতে সাহায্য পাওয়া উপকৃত হইয়াছে, কিম্বা উপকৃত হইতে আশা করে, নিশ্চয় তাহারা নিজেদের সাধ্যমত জকাৎ দান করিয়া, এই সকল টাকার গাছের গোড়ায় জল সেচন করিবে। যে দানকে তাহাদের তেজারতির মূলধন করিয়া দানগ্রাহীরা লাভবান হইয়াছে, অর্থাৎ তাহারা স্বেচ্ছাক্রমে তাহাদের উপার্জিত

লাভের টাকা প্রতি অন্ততঃ এক পয়সা হইলেও সেই দানভাণ্ডারে দান করিবে। তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে সেই জঁকাতের টাকার পাছ এত বদ্ধিত হইবে, যে তাহার ফলে সেই সেই গ্রাম টাকায় ভাসিয়া যাউবে। যুরোপে যেমন দেখা গিয়াছে, ঐ টাকাদ্বারা ইচ্ছামত গ্রামের নানাবিধ হিতকর কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করা যাউতে পারিবে। তখন সততা বা ঈমানেরও মূল্য লোকে বুঝিবে। অসৎ বে-ঈমানেরা যখন দেখিবে, যে সচ্চরিত্র ঈমানদার লোক জঁকাতের ভাণ্ডার হইতে বিনা সুদে অর্থ সাহায্য লাভ করিয়া, আপনাদের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতেছে, তখন, যুরোপে যেমন হইয়াছে, বে-ঈমান অসৎ লোকেরাও সৎ এবং ঈমানদার হইতে চেষ্টা করিবে। দেশের হাওয়া সম্পূর্ণ বদলিয়া যাইবে। তখনই সেই জঁকাতের ধন-ভাণ্ডার সম্বন্ধে পূর্ন্ববাক্ত কোরাণবচন সফল হইবে :- “তোমরা সুদখোঁরীতে যাহা লয়ী কর, যেন তাহা মানুষের সম্পত্তিরূপে বৃদ্ধি পায়, তাহা আল্লার নিকটে বৃদ্ধি পাইবে না। আর পরমেশ্বরের সন্তোষের জন্য তোমরা জঁকাতরূপে যাহা লাগাও, একরূপ লোকই অনেক লাভবান হইবে” (রুম ৩০)-৩৯)।

আমরা কি তবে আশা করিতে পারিমা, যে হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া, পাশ্চাত্য উন্নত জাতিসকলের মত, সততামূলক জঁকাত বা দানভাণ্ডার সংক্রান্ত কোরাণের অমূল্য উপদেশ গ্রহণ করিবে। “দরিদ্রান্ ভর কোঁস্তয়,” “ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ যজ্ঞোহ-
ধ্যয়নং দানং”। দরিদ্রার্থে ধন দান হিন্দুরও প্রধান ধর্ম্ম। সত্য এবং মঙ্গল সম্বন্ধে কোনরূপ জঁতিভেদ বা জঁতিগত

বিদ্বেষের স্থান নাই, কারণ মানব প্রকৃতি এক। যদিই বা বর্তমান হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষের দিন, হিন্দুর পক্ষে মুসলমানের জ্বকাতের দান ভাণ্ডারে যোগ দেওয়া সম্ভবপর না হয়, তবে আমরা হিন্দুগণও কেন পাশ্চাত্য সভ্য জাতি সকলের অনুকরণে, কোরাণের উপদেশ মত দানভাণ্ডার স্থাপন করিয়া, যাহাতে সচ্চরিত্র হিন্দুও তাহার সচ্চরিত্রের বলে, বিনা সুদে, বিনা বন্ধকে, মূলধন পাইয়া, শিল্পবাণিজ্য অবলম্বন করিয়া, দেশের অর্থবৃদ্ধি করিতে পারে, মেরুপ একএকটি টাকার গাছ প্রতি গ্রামে লাগাইব না, যে টাকার গাছের বলে বিদেশীয়েরা তেজ্জারতি করিয়া, দুনিয়ার ধন দিয়া স্ব স্ব দেশ পূর্ণ করিতেছে। তখন বঙ্গবাসীরও দৈনিক আয় ১০ ছয় পয়সার পরিবর্তে, আমেরিকার মত চৌদ্দটাকা, না হয়, বিলাতের মত ৬।০ সাড়ে ছয় টাকা, না হয়, জাপানের মত ৫২ পাঁচ টাকা হইবে, এবং উপযুক্ত আহারাদি লাভ করিয়া বঙ্গবাসীর ও আয়ু গড়ে ২২ বৎসরের পরিবর্তে আমেরিকার মত ৫৬ বৎসর, না হয়, বিলাতের মত ৫০ বৎসর, না হয়, জাপানের মত আটচল্লিশ বৎসর হইবে। “শতং জীব শরদো বর্দ্ধমানঃ” (ঋ, ১০-১৬১-৪), “শতায়ুৈব পুরুষঃ”, শতবৎসর আয়ু বৈদিক হিন্দুর আদর্শ। সেই সুফল লাভকল্পে আমরা কি “চরিত্রমূলক যৌথ দানভাণ্ডার” প্রতিষ্ঠাদি উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিব না ? (See in Wolff's People's Banks, the chapters on Raiffeisen Village Banks, and Wollenberg's Casa Rurali) ।

মুস্লেম সমাজে প্রচলিত নমাজ বা উপাসনা ।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে ‘নমাজ’ শব্দ পার্শ্ব শব্দ, কোরাণের ‘সালাত’ শব্দের প্রতিশব্দ, বৈদিক নমস্ শব্দের সহোদর । এমন কি ‘সজ্জা’ করিবার সময়ে যেরূপ হাটুগাড়ীতে হয়, বৈদিক ঋষিগণ ও তাঁহাদের পূজার সময়ে সেইরূপই হাটু গাড়িতে— “সপর্যাবো ভরমাণা অভিজ্জু, প্র রঞ্জতে নমসা বহিরগ্নৌ” (ঋ. ৭-২-৪), “ইবা প্রদানদ্বারা পূজাকারীগণ (সপর্যবঃ) জ্ঞানু নত করিয়া (অভিজ্জু) পাদাস্ত্রুষ্ঠ, ভরদিয়া (ভরমাণাঃ) (জ্যোতির্ময় পরামেশ্বরের দৃশ্য সংকতস্বরূপ) অগ্নিতে (ভক্তি-কৃতজ্ঞতার সংকত-স্বরূপ) ঘৃতাদি ইবাসহ তৃণদান করিতেছে” ।

আমরা দেখাইয়াছি যে প্রকৃত নমাজ, যাহা ইসলাম ধর্মের প্রাণ, শুধু কথার নমাজ নয় । তাই কোরাণ বলিতেছে :— “ইম্মা স্সালাতা তান্হা আনেল্ ফাহ্শায়ে ও-আল্ মুনকারে”. আন্কাবুত (২৯)—৪৫; “নিশ্চয় নমাজ লোককে অশ্লীলতা এবং কুক্রিয়া হইতে রক্ষা করে” । যে নমাজ লোকে বুঝে না, লোককে অশ্লীলতা এবং কুক্রিয়া হইতে রক্ষা করে না, তাহাকে ‘নমাজ’ বলা কি তবে ঠিক ? তাই কোরাণ বলিতেছে :— “ফা উ-আইলুন্ লিল্ মুসাল্লীনা, ল্লাজীনা হুম্ আন্ সালাতে হিম্

সাহ্ন, ল্লাজীনা হুম্ ঈয়ুরা-উনা, ও-আ ইয়াম্‌নাউনাল্ মাউনা ”।
 মা-উন্ (১০৭)—৪,৫॥ “সেই প্রার্থনাকারীদের জন্য আক্ষিপ,
 যাহারা তাহাদের নমাজের মর্ম গ্রহণ করে না, যাহারা লোককে
 দেখাবার জন্য কার্য্য করে, এবং অনুমাত্রও লোকের সাহায্য
 করে না”। “Words without thoughts never to
 heaven go,” “সরল প্রার্থনাই মুক্তির সাধনা” (ব্রহ্মসঙ্গীত)।
 বস্তুতঃ প্রকৃত নমাজ, শুধু ইসলাম ধর্ম কেন, সকল প্রকৃত
 ধর্মেরই আত্মা অন্নজল— “The bread of life”। কোরাণ
 বলিতেছে :—“আমার উপাসকগণ যখন তোমাকে আমার
 বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে, তখন নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আমি
 প্রার্থীর প্রার্থনার উত্তর দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। অতএব
 আমার আহ্বান তাহাদের শোনা উচিত, এবং আমাতে বিশ্বাস
 স্থাপন করা উচিত, যেন তাহারা প্রকৃত পথে চলিতে পারে”।
 বকরাহ্ (১)—১৮৬॥ জাগ্রত জীবন্ত পরামশ্বরের জাগ্রত
 জীবন্ত ভাবে উপাসনা হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মেরই সার তত্ত্ব।
 মানবাত্মাত্মারই জন্য অতি উপাদেয় অন্নজল। ফোজ্‌লি
 আম যেমন হিন্দু-মুসলমান নির্নিশেষ সকলের শরীরের পক্ষেই
 অতি উপাদেয় বস্তু, নমাজও সেইরূপ হিন্দু-মুসলমান নির্নিশেষ
 সকল মানবের আত্মার পক্ষেই সেইরূপ, অথবা ততোধিক
 উপকারী। যেজন্যই একালের মুসলমান যাহা করে না, কোরাণ
 হজরত মহম্মদকে কাফরদের সঙ্গে—“ল্লাজীনা কাফারু”
 (১০১)—নমাজ করিতে বলিতেছেন, “ফা আকামাতা লাহমু-

সুমালাতা" নিসা (৭)---১০১। হায়, হিন্দু-মুসলমান যদি এদেশে নমাজের প্রকৃত মর্ম পরিগ্রহ করিয়া একত্র নমাজ পড়িত, বা উপাসনা করিত, তবে কতই না সুফল ফলিত !

পাঁচ বেলা নমাজ ।

মুসলমানদের মধ্যে অধুনা দিনে পাঁচবার নমাজ পড়ার নিদি প্রচলিত ।

- ১। ভোর বেলার নমাজ (সলাৎ-উল্ ফজ্জর) ।
- ২। মধ্যাহ্নকালের বা বেলা ১২টার পরের নমাজ (সলাৎ উজ্জুহ্ র)।
- ৩। অপরাহ্ন কালের বা বেলা ৩টার পরের নমাজ (সলাৎ টল্-আস্ র) ।
- ৪। সূর্যাস্তের সময়ের নমাজ (সলাৎ উল্-মঘ্ রিব) ।
- ৫। শয়ন কালের পূর্বের নমাজ (সলাৎ উল্-ইশা)।*

নমাজের অঙ্গভেদ ।

(১) বাহ্যশুদ্ধি ।

একালে মুসলমানদের মধ্যে অনেক প্রকার বাহ্যশুদ্ধির সাধনা প্রচলিত আছে ; তন্মধ্যে কোরাণে আমরা ওজুর ও স্থানেরই

* এতদ্বির শেষ রাতে প্রার্থনার (তাহাজ্জুদ) এবং মধ্যাহ্নকালের পূর্বের প্রার্থনার (হুহা) ও ব্যবস্থা আছে ।

বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাউ। কোরাণ বলিতেছে) — “হে বিশ্বাসীগণ, যখন তোমরা নমাজের জন্য উঠ, তখন তোমার মুখ এবং কনুই পর্য্যন্ত হাত ধৌ, তোমার মস্তক মুছ, এবং তোমার গোড়ালি পর্য্যন্ত পা ধৌ, এবং যদি তোমার শারীরিক অপবিত্রতা থাকে, তবে স্নান কর”— মাইদাহ্ (৫)-৬। সেই সাক্ষ্য বলা হইতেছে :—“পরমেশ্বর ইচ্ছা করেন না, যে তোমা-দিগকে কোন কাষ্টে ফেলেন, কিন্তু তিনি ইচ্ছা করেন যে তোমা-দিগকে পবিত্র করেন”, মাইদাহ্ (৫)-৬। বস্তুত অস্ত্রের শুদ্ধি-সাধনই বাহ্য শুদ্ধির লক্ষ্য,—এবং সেই উদ্দেশ্যেই কত কত বলেন যে, যে সকল বাহ্য যন্ত্রদ্বারা,—যথা হাত, পা, মুখ, নাক এবং মস্তক, অথবা সমস্ত শরীর,—লোকে পাপাচরণ করে, পরমেশ্বরের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহার সাক্ষাৎ উপস্থিত হইবার পূর্বে, সর্ব্বাঙ্গে সে সকল যন্ত্রকে বাহ্য মলিনতা হইতে মুক্ত করিতে হয়। তবে প্রকৃত অস্ত্রের শুদ্ধিসাধনে যাহার অমনোযোগ, তাহার পক্ষে বাহ্য শুদ্ধি-সাধনা, কৃষকের শস্য পরিত্যাগ করিয়া ভুষ গ্রহণের তুল্য, বৃথা। আবার কোনাংশে ব্যবস্থা দুই প্রকার :—বিশ্বজনীন (আয়াতুন্ শ্বুকামাতুন্) এবং স্থানীয় (মুতাশাবেহাতুন্) বা আরব দেশের জন্য (ইমরান্ (৩)-৬)। আরবের মত গরম দেশে কৃষি-শিল্প-জীবী লোকদের মধ্যে এই প্রকার উজু ও স্নানের ব্যবস্থা যে কত আরাম-প্রদ, এবং শরীর-শোধনকারী, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু প্রকৃত ইসলাম “আয়াতুন্ শ্বুকামাতুন্,” নিত্যসত্য।

বিশ্বজনীন। তাহাই কোরাণের মূল, “উম্মুল্ কেতাবে” (৩-৬)। ‘আইস্লেগু’, কি ‘নরোয়ে’, ‘এমন কি বিলাতের মত শীত-প্রধান দেশের মুসলমানদিগকে ঐ প্রকার উজু দিনে পাঁচবার করিতে হইলে, অথবা বিলাতাদি যে দেশের লোক বৎসরে দু একবারের বেশী স্নান করে না, সে দেশের লোককে প্রত্যহ স্নান করিতে হইলে, নিশ্চয় তাহা-দিগকে কোরাণের উপদেশেরই বিরুদ্ধে, মহা কষ্ট ফেলা হইবে, “যাহা ঈশ্বর ইচ্ছা করেন না”। কোরাণ নিজেই তাহাদের জন্য দেশকালোচিত ব্যবস্থার বিধি দিয়া বলিতেছেন,— “প্রত্যেক জাতির জন্য আমি ধর্ম-প্রণালী নির্ধারণ করিয়াছি, যাহা তাহারা অনুসরণ করে”—“লেকুল্লৈ উম্মাতিন্ জা-আল্না মনসাকান্ হুম্ নােসেকুহো”, হজ্জ্ (২২)— ৬৭।

(২) আজান ও একামৎ

সামাজিক নমাজে আজান দিতে হয়। ‘কেব্লা’ বা সমস্ত মুসলেম জগতের দৃশ্য মিলন-কেন্দ্র-স্বরূপ মক্কার কাবারদিকে মুখ ফিরাইয়া, হস্তদ্বয় কান পর্যন্ত উঠাইয়া, উচ্চঃস্বরে সকলকে নমাজে আহ্বান করিতে হয়। ইহারই নাম আজান। খৃষ্টান ঘণ্টা বাজাইয়া উপাসকদিগকে ডাকে, হিন্দু শঙ্ক, ঘণ্টা, কাশী বাজায়। মুসলেম তৎপরিবর্তে অতি হৃদয়-

গ্রাহী বাক্য, অতি মিন্ট গম্ভীর স্বরে চিৎকার করিয়া, উপাসক-
মণ্ডলীকে এই বলিয়া নমাজে আহ্বান করে :—

(১) আল্লাহ্ আক্বাবু চারিবার

পরমেশ্বর সকলের শ্রেষ্ঠ বা পবিত্র।

২। আশ্‌হাদু আন্ লা ইলাহা ইল্লা ল্লাহা। আশ্‌হাদু =
সাক্ষ্যদিতেছি। আন্ = আমি। দুইবার। আমি সাক্ষ্য দিতেছি,
পরমেশ্বর বাতীত উপাস্ত নাট।

৩। আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ রাসূলো ল্লাহে। আমি
সাক্ষ্য দিতেছি, যে মুহাম্মদ পরমেশ্বরের পেরিত। দুইবার।

৪। হাটয়া আলা স্‌লাতে। ডানদিকে মুখ করিয়া
দুইবার। হাটয়া = আটস। উপাসনাতে উপস্থিত হও।

৫। হাটয়া আলান্ ফালাহে। বামদিকে মুখ করিয়া
দুইবার। ফালাহে = মঙ্গল লাভার্থ। মঙ্গল লাভার্থ উপস্থিত
হও।

৬। আল্লাহ্ আক্বাবু। দুইবার।

৭। লা ইলাহা ইল্লা ল্লাহু। দুইবার। এতদ্ব্যতীত
ভোর বেলার উপাসনার আজান দিবার সময়, (৫) এবং (৬)
বাক্যের মধ্যে, বলিতে হয় :—

আস্-সালাতো খাইরুন্ শ্বিনা রাউমে। দুইবার। খাইরুন্ =
কল্যাণপ্রদ। শ্বিনা = হইতে। রাউমে = নিদ্রা। উপাসনা,
নিদ্রা হইতে অধিক কল্যাণপ্রদ।

আজানের পর উপাসকগণ, সারিবদ্ধ হইয়া, কেবলার দিকে মুখ করিয়া, উপাসনার স্থানে দাড়াইলে পর, “একামৎ” বলিতে হয়। তাহাতে আজানের মূল বাক্যগুলি আবার একবার করিয়া বলা হয়। এমং সেই সূত্র (৫) বাক্যের পরে “কাদ্ কামাতে সুসালাতো”—“নিশ্চয় উপাসনা আরম্ভ হইয়াছে”, এই বাক্য দুইবার বলা হয়।

(৩) নমাজ,—ফরজ ও সুন্নত।

নমাজ অনেক প্রকার। তাহার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া আমাদের পক্ষে অসাধ্য : সুধু তাহা নয়, আমাদের পক্ষে তাহা অনধিকারচর্চা। সাধারণ সামাজিক নমাজকে ‘ফরজ’ বলে, অর্থ “অবশ্য কর্তব্য”। তাহাতে একজন ইমাম্ বা আচার্য্য বা চালক থাকে। লোক সকলকে ডাকিয়া, সামাজিক ভাবে দলবদ্ধ হইয়া, ‘ফরজ’ নমাজ করিতে হয়, যেন তাহা অবিশ্বাসীদিগের ও চিন্ত আকর্ষণ করিবার জন্য বিশেষ দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়। সাধারণ ব্যক্তিগত নমাজকে ‘সুন্নত’ বলে, অর্থ “সর্বদা কর্তব্য।” ফরজ নমাজের অনুকরণেই সুন্নতাদি নমাজ করিতে হয়। শুক্রবারের জুম্মা নমাজে ইমাম্ বা আচার্য্য যে একটি উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহার নাম ‘খুৎবাহ্’। এ স্থলে

মাত্র ফরজ নামাজের একটি সাধারণ বর্ণনা পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করা আমাদের উদ্দেশ্য ।

৪ । ফরজ নামাজের বর্ণনা ।

‘একামৎ’ বা “নমাজ ঠিক আরম্ভ হইয়াছে”---“কাদ্ কামাত স্ সলাত”---বলা হইলে পর, ‘কেব্লা’ বা উসলাম দর্শনের কেন্দ্র-স্বরূপ মক্কার ‘কাবা’র দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া, দুই হাত কাণ পর্য্যন্ত উঠাইয়া, “আল্লাহ্ আক্বার” “পরমেশ্বর সকলের শ্রেষ্ঠ” বলিতে হয় । ইহার নাম “তক্বির-ই-তাহ্ রিমাহ্ ।” তাহার পর “কিয়াম,” অর্থাৎ বুকের উপরে বাম হাতের উপরে ডান হাত রাখিয়া, দাঁড়াইয়া বলিতে হয় :---“ইন্নী ওআজ্জাহ্ ত্তা” ইত্যাদি, * “নিশ্চয় আমি একাগ্রচিত্তে আমার মুখ তাঁহার দিকে

* ইন্নী (নিশ্চয় আমি) ওআজ্জাহ্ ত্তা (মুখ কিদাইতেছি) ও-আজ্-হিয়া (আগার মুখ) লিল্লাহী (তাঁহার দিকে, যিনি) ফাত্বারাম্ (সৃষ্টি করিয়াছেন) সমাওয়াতে (আকাশ) ও-আল আদা (এবং পৃথিবী) হানিফান্ (একাগ্রচিত্ত হইয়া), ও-আ মা আনা (এবং আমি নহি) মিনাল্-মুশ্-রেকীনা (ঈশ্বরের শরীক-স্বীকারকারীদের মধ্যে)। ইন্নী (নিশ্চয়) স্ সলাতী (আমার প্রার্থনা) ও- আ মুম্বুকি (আমার উপহার) ও-আ মাহ্ য়া ও-আ মাগাতী (আগার জীবনও আমার মৃত্যু) লিল্লাহে (পরমেশ্বরের জন্য), রাব্বুল্ আলামিন্

কিরাউয়াছি. যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন ; এবং আমি ঈশ্বরের শরীক-স্বীকারকারীদের মধ্যে নহি । নিশ্চয় আমার প্রার্থনা এবং আমার উপহার, এবং আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু পরমেশ্বরের হস্তে, যিনি বিশ্বসংসারের প্রতিপালক । তাহার কোন শরীক নাই : এবং ইহাই আমার প্রতি আদেশ । এবং যাহারা ঈশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করে, আমি

(যিনি বিশ্বের প্রতিপালক) । লা শারীকা লাহ (তাহার কোন শরীক নাই), ও-আ বেজালেকা (এবং ইহাই) উগের্তে (আমি প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছি), ও-আ আনা (এবং আমি) মিনাল্-মুস্লেমীনা (যাহারা তাহার বশ্যতা স্বীকার করে, তাহাদের মধ্যে আছি) । আল্লাহুমা (হে পরমেশ্বর) আন্তালা-মালেকে (তুমি রাজা) লা এলাহা এল্লা আস্তা (তুমি ভিন্ন ঈশ্বর নাই), আস্তা রব্বী (তুমি আমার প্রতি পালক), ও-আ আনা আব্দোকা (আমি তোমার উপাসক); জালাম্ভো নফসী (আমি নিজের আত্মার প্রতি অত্যাচার করিয়াছি), ও-আ' তারাফ্ভো বেজানবী (এবং আমি আমার দোষ সকল স্বীকার করি), ফা'গ্গ্ফের্ণী জুহুবী জামিরান্ (অতএব আমার দোষ সকল হইতে আমাকে মুক্তিদান কর), ইয়াহো লা ইয়াগ্গ্ফের্ণী জুহুবা ইল্লা আস্তা (নিশ্চয় তুমি ভিন্ন কেহ দোষ হইতে মুক্তিদান করিতে পারে না), ও-আহ্দিনী লে আত্-সা-নেল্ আখ্-লাকে (এবং আমাকে উৎকৃষ্ট সদাচারের দিকে চালনা কর), লা ইয়াহ্দি লে আহ্-সানেহা ইল্লা আস্তা (কারণ তুমি ভিন্ন কেহ উৎকৃষ্ট সদাচারের দিকে চালনা করে না); ও-আস্-রেফ্ আন্নী সায়িয়াহা (এবং আমা হইতে অসদাচার দূর কর), লা ইয়াস্-রেফ্ আন্নী সায়িয়াহা ইল্লা আস্তা (যেহেতু তুমি ভিন্ন কেহ আমা হইতে অসদাচার দূর করিতে পারে না) ।

তাহাদের একজন। হে পরমেশ্বর, তুমিই রাডা, তুমি ভিন্ন কোন ঈশ্বর নাও। তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার উপাসক। আমি নিজের আত্মার প্রতি অত্যাচার করিয়াছি, এবং আমি আমার দোষ সকল স্বীকার করি। অতএব আমার সমস্ত দোষ হইতে আমাকে মুক্তি দান কর, এবং আমাকে টেক্ষ্টে সদাচারের দিকে চালনা কর, কারণ তুমি ভিন্ন কেহ টেক্ষ্টে সদাচারের দিকে চালনা করে না। এবং আমি হইতে অসদাচার দূর কর, কারণ তুমি ভিন্ন কেহ আমি হইতে অসদাচার দূর করিতে পারে না।

এই প্রার্থনাটি কি মর্ম্মস্পর্শী কি কল্যাণ-কর! যদি মুসলমান-সাধারণ বুঝিয়া স্মৃতিয়া সরল অন্তরে এই প্রার্থনাটি করিত, তবে নিশ্চয় মুসলমান প্রকৃত মানুষ হইত। সচরাচর টেক্ষ্টে বিস্তারিত প্রার্থনার পরিবর্তে “সুবহানালাহা তালালাহুমা”-ইত্যাদি “হে পরমেশ্বর, পবিত্রতা তোমারই, প্রশংসা তোমারই, এবং তোমার নাম ধন্য : তোমার গৌরব সর্ব্বোচ্চ : এবং তোমা ভিন্ন অন্য কোন উপাস্য নাও। সকলের হেয়, পাপ-দেবতার অনিষ্ট-কারিতা হইতে আমি পরমেশ্বরের আশ্রয় লইতেছি” †।

† সুবহানালাহা তালালাহুমা (হে পরমেশ্বর, পবিত্রতা তোমারই), বেহাম্বেদকা (প্রশংসা তোমারই), ও-আ তাবারাকাসমুকা (এবং তোমার নাম ধন্য), ও-আ তা-আ-লা জাদুকা (এবং তোমার গৌরব সর্ব্বোচ্চ), ও-আ লা ইলাহা (এবং উপাস্য কেহ নাও) গাইককা (তুমি ভিন্ন), আ-উজু বেলাহে (আমি পরমেশ্বরের আশ্রয় লইতেছি), মিনাশ-শাইতানেব্ রাকীমে (হারিহিত পাপের দেবতা হইতে)।

অতঃপর দণ্ডায়মান থাকিয়াই সূরা ফাতেহা বলিতে হয় (পৃ: ৩ দেখ)। তাহা শেষ হইলে পর, সকলে “আমিন” (Amen) বা “তথাক্ত” বলিতে হয়।

তৎপর অণ্ড একটি কোরাণের সূরা, যথা সূরা ইখলাস (পৃ: ৮ দেখ), অথবা কোরাণের যে কোন অংশ উপাসকের স্মরণ হয়, তাহাষ্ট বলিতে হয়।

তৎপর “আল্লাহ্ আক্বার” বলিয়া রুকু করিতে হয়, অর্থাৎ মস্তক কিঞ্চিৎ অবনত করিয়া হাটুর উপরে হাতের তলায় রাখিতে হয়। রুকু করিয়া তিন বার বলিতে হয়—“সুব্‌হানা রাব্বিয়াল্ আক্বীম”*—“পবিত্রতা আমার প্রতিপালকের, যিনি মহান্।

তৎপর দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে হয়, “সামি-আ ল্লাহ্ লেমান্ হামেদাহো”। “রব্বানা ও-আ লাকাল্ হাম্দো”—†“পরমেশ্বরের স্তুব করিলে, তিনি তাহা গ্রহণ করেন”। “হে আমার প্রভু, প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য”।

তৎপর সজ্‌দা বা মাটিতে মাথা দিয়া নমস্কার করিতে হয়,- অর্থাৎ দুই পায়ের রুকাঙ্গুলি, দুই হাটু, এবং দুই হাত দ্বারা মাটি স্পর্শ করিয়া, মস্তকদ্বারা মাটি স্পর্শ করিতে হয়। এবং সে ভাবে থাকিয়া তিনবার বলিতে হয় :—

* সুব্‌হানা - পবিত্রতা। আক্বীম - মহান্

† সামি-আ - গ্রহণ করেন। হামেদাহ্ = প্রশংসা।

“সুব্‌হানা রক্বিয়াল আ'লা,” “পবিত্রতা আমার প্রভুর,
তিনিই সর্বোচ্চ”

অতঃপর উপাসক ভক্তিভাবে বসিবে । ইহারই নাম
কুলসাহ্ ।

তৎপর আবার পূর্ববৎ সজ্জা করিয়া তিনবার বলিতে হয়
সুব্‌হানা রক্বিয়াল্ আ'লা । ইহাতেই নমাজের প্রথম রেকাত
শেষ হইল ।

আবার দাঁড়াইয়া পূর্ববৎ দ্বিতীয় ‘রেকাত’ নমাজ পড়িতে হয় ।
তাহা প্রথম রেকাতেরই অনুরূপ, তবে শেষ করিয়া দাঁড়াইবার
পরিবর্তে ভক্তিভরে হাটুগাড়িয়া (কাহ্‌দাহ্) পরমেশ্বরের
মহিমা কীর্তনের সহিত, হজরতের জন্ম, সমবিশ্বাসীদের জন্ম
এবং নিজের জন্ম এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে হয় :—বাক্য,
কার্য্য এবং ধনদ্বারা কৃত সকল সম্মান এবং উপাসনা পর-
মেশ্বরের জন্ম । হে নবী, তোমার উপরে পরমেশ্বরের শান্তি
হউক, এবং পরমেশ্বরের আশীর্বাদ এবং অনুগ্রহ । তাঁহার
আশীর্বাদ এবং অনুগ্রহ আমাদের উপরে, এবং তাঁহার সৎ-
কর্ম্মশীল দাসদের উপরে বর্ষিত হউক । আমি সাক্ষ্য দিতেছি
যে পরমেশ্বর ভিন্ন কোন উপাস্ত নাহি ; এবং আমি সাক্ষ্য
দিতেছি যে মুহম্মদ তাঁহার দাস ও প্রেরিত” *। এই প্রার্থনারই
নাম “তাহিয়্যাহ্” ।

+ আৎ তাহিয়্যাতো (সমস্ত সম্মান) লিল্লাহে ও-আ স্‌লালা ও-আতো
(এবং উপাসনা) ও-আ স্‌লায়্বাতো (এবং ধন) আস্‌লালামো স্‌লাইকা

যদি উপাসক দুই রেকাতেও অধিক বলিতে ইচ্ছা করে, তবে আবার পূর্ববৎ দাঁড়াইয়া তাহা বলিতে হইবে। আর দুই রেকাতেই নমাজ শেষ করা তাহার অভিপ্রায় হইলে, হজরতের প্রতি আশীর্বাদসূচক এই প্রার্থনাটি করিতে হইবে :—“হে পরমেশ্বর, তুমি মুহম্মদ এবং তাহার অনুগামী দলকে কৃতকার্য্য কর, যেমন তুমি ইব্রাহিম এবং তাহার অনুগামীদিগকে কৃতকার্য্য করিয়াছিলে : নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত এবং মহিমান্বিত। হে পরমেশ্বর, মুহম্মদ এবং তাহার অনুগামীদিগের উপর আশীর্বাদ বর্ষণ কর, যেমন তুমি ইব্রাহিম এবং ইব্রাহিমের অনুগামীদিগের উপরে করিয়াছিলে। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত এবং মহিমান্বিত *

আ ইয়াহা রবিয়া ৩-আ রাত্মাতে (আশীর্বাদ) রাতে ৩-আ বারাকাতুহে (অঙ্গুগ্রহ)। আদনালানো আলাইনা, ও-আ আলা বোদে (দাস) রাতে সালেহীনা (সংকল্পণীল)। আশ্হাদো আনল্লা ইলাহা ইলা রাহো ৩-আ আশ্হাদো আনল্লা মুহাম্মাদান্ আনুহুহো ৩-আ রাসুলুহো।

* আনল্লা হুয়া (হে পরমেশ্বর) সালে (দয়া কর) আলা মুহাম্মাদিন্ (মুহম্মদের উপরে) ৩-আ আলা আলি মুহাম্মাদিন্ (এবং মুহম্মদের অনুগামীদের উপরে) কামা স্লামাইহা (যেমন দয়া করিয়াছিলে) আলা ইব্রাহিমা (ইব্রাহিমের উপর) ও-আ আলা আলে ইব্রাহিমা (এবং ইব্রাহিমের অনুগামীদের উপর)। ইলাকা (নিশ্চয় তুমি) হামিদ্দন্ (প্রশংসিত) মজিদ্দন্ (মহান)। আনল্লাহুয়া বারিক (হে পরমেশ্বর, আশীর্বাদ কর) আলা মুহাম্মাদিন্ ও আলা আলি মুহাম্মাদিন্ কামা বারাকাতা (যেমন তুমি আশীর্বাদ করিয়াছিলে) আলা ইব্রাহিমা ও আলা আলে ইব্রাহিমা, ইলাকা হামিদ্দন্ মজিদ্দন্ (নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত এবং মহান ।)

(শেষ সেলামের পূর্বে এটি প্রার্থনা এবং পরবর্তী প্রার্থনা সর্বদাষ্ট করিতে হয় । সেই পরবর্তী প্রার্থনা এই :- “হে পরমেশ্বর, নিশ্চয় আমি নিজের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছি । এবং দোষ হইতে রক্ষা করিতে পারে, তুমি ভিন্ন কেহ নাই । অতএব তোমার রক্ষাধারা আমাকে রক্ষা কর, এবং আমার প্রতি দয়া কর ; নিশ্চয় তুমি মার্জনাকারী দয়াময়” । † ।

উহাতেই নমাজ শেষ হইল । নমাজের শেষে বিশ্বাসীগণ পরস্পরকে কল্যাণ কামনা পূর্বক একবার ডানদিকে, আবার বামদিকে, মুখ ফিরাইয়া, এই বলিয়া অভিবাদন করিবেন :- “আস-সালামু আলাইকুম ও-আ রাহমাতো ল্লাহে” - - “তোমাদের প্রতি শান্তি এবং পরমেশ্বরের দয়া হোক” ।

সামাজিক নমাজে উপাসকদিগকে ‘ইমাম্’ বা আচার্য্যের অনুসরণ করিয়া, প্রার্থনাদি এবং কাতেগাদি উচ্চারণ করিতে হয় । ককু করার পর ইমাম্ যখন দাঁড়াইয়া বলেন :- “সামি-আ ল্লাত্ লিমান্ হামিদাহো,” “পরমেশ্বর তাহাকে গ্রহণ করে যে তাঁহার

† আলাহম্মা (হে পরমেশ্বর) ঈরি (নিশ্চয় আমি) আলাহম্মতো (অত্যাচার করিয়াছি) নাফসী (আমার আত্মার উপর) জুজমান্ (অত্যাচার) কাসীরান্ (অত্যন্ত) ও-আ লা ইয়াগ্-ফেকক্ জুজ্বা (এবং কেহ দোষ করা করেনা) ইলা আলা (তুমি ভিন্ন) ফাগ্-ফেকলী (অতএব আমাকে রক্ষা কর) মাগ্-ফেরাতান্ শিন্ একক। (তোমার রক্ত রক্ষাধারা) ও-আর হামনী (এবং আমার প্রতি দয়া কর) উহাকা আত্ভান্ (নিশ্চয় তুমি) গাকুনো (মার্জনাকারী) র্-আতিমো (দয়াময়) ।

স্তুত করে, "ইলাসক-মগুনী তখন বলেন :—“রব্বানা .ও-আ লাক্
আলু-গাম্দো,” “হে আমাদের প্রভু, সমস্ত প্রশংসা তোমারই” ।

নমাজের এই বর্ণনা আমরা হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান সর্ব-
সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম । ইহাতে সাম্প্রদায়িক
কোনরূপ সঙ্কীর্ণতার নামগন্ধও দেখিতেছি না । বস্তুতঃ এই নমাজে
উদারতার পরাকাষ্ঠাই প্রদর্শিত হইয়াছে । কি হিন্দু, কি খ্রীষ্টান,
এই নমাজ ব্যবহার করিতে আপত্তি করিতে পারে, এমন কিছু
দেখিতেছি না । বুঝিয়া সৃজিয়া ভক্তির সহিত ইহা ব্যবহার
করিলে, মানুষ মাত্রই বিশেষ উপকার লাভ করিতে পারে ।

সর্বশেষে “কুণুত” নামক যে প্রার্থনাটি, ইশা বা রাত্রির
নমাজের শেষ বেকাতের পরে উচ্চারিত হয় । তাহার বঙ্গানুবাদও
আমরা পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া, “মুসলমান সমাজে
প্রচলিত নমাজের” এই বর্ণনা শেষ করিতেছি । “হে পরমেশ্বর,
আমরা তোমারই সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি, এবং তোমার নিকটে
রক্ষা ভিক্ষা করিতেছি, এবং তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি,
এবং তোমারই উপরে নির্ভর স্থাপন করিতেছি, এবং উত্তমরূপে
তোমার মহিমা কীর্তন করিতেছি, এবং তোমার নিকটে কৃতজ্ঞ
হইতেছি ; এবং তোমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হই না, এবং যে
তোমাকে অমান্য করে, তাহাকে দূরে রাখি, এবং তাহার সহিত
সংস্রব রাখি না । হে পরমেশ্বর, তোমাকেই পূজা করি, এবং
তোমারই নিকটে প্রার্থনা করি, এবং তোমাকেই প্রণিপাত করি,
এবং তোমারই নিকটে দৌড়িয়া যাই, এবং সত্বর আশ্রয় লই,

এবং তোমার দয়ার আশা করি, এবং তোমার শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয় তোমার শাস্তি অবিশ্বাসীদের উপরে পতিত হয়” * ।

আল্লাহ্ম! (হে পরমেশ্বর) ইয়া (নিশ্চয়) নাস্তাগ্‌ফুরুকা (তোমার নিকটে আমরা সাহায্য চাইতেছি) ও-আ নাস্তাগ্‌ফুরুকা (তোমার নিকটে আমরা ক্ষমা চাইতেছি) , ও-আ মু'মেন্ন বিকা (তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি) , ও-আ নাতাও-আকালু 'আলাইকা (এবং আমরা তোমার উপরে নির্ভর করিতেছি) ও-আ মুস্নী 'আলাইকাল্ গাউকা (এবং উত্তমরূপে তোমার মহিমা কীর্তন করিতেছি) , ও-আ নাশ্‌কুরুকা (এবং তোমার নিকটে কৃতজ্ঞ হইতেছি) , ও-আ লা নাশ্‌কুরুকা (এবং তোমাতে অবিশ্বাস করিনা) , ও-আ নাখ্‌লা-উ (এবং দূর করি) ও-আ নাংকুরু (এবং সংশয় রাখিনা) মান্ ইয়াফ্‌জুরু কা (তাহার সহিত যে তোমাকে অমান্য করে) । ' আল্লাহ্মা ইয়াকা (তোমাকেই) না'বুদো (আমরা পূজা করি) , ও-আ লাকা (তোমারই নিকটে) মুসাল্লী (আমরা প্রার্থনা করি) , ও-আ নাস্‌জুহু (তোমাকেই আমরা প্রণিপাত করি) , ও-আ ইলাইকা নস্‌'আ (তোমারই জন্ত দৌড়িতেছি) ও-আ নাহ্‌ফিহু (আমরা তোমারই আশ্রয় লই) ও-আ নার্‌জু (এবং আমরা আশা করি) রহ্‌গাতাকা (তোমার দয়া) , ও-আ নাখ্‌শা (ভয় করি) 'আজাবাকা (তোমার শাস্তিকে) , ইয়া (নিশ্চয়) 'আজাবাকা (তোমার শাস্তি) বিল্-কুফ্‌কারি (অবিশ্বাসীদের উপরে) মুল্‌হিকুন্ (পতিত হইবে) ।

সর্লধর্ন্য সমন্বয় ।

(Harmony of Religions)

‘নমাজ’ ইসলাম ধর্নের প্রাণ । তাহারই বঙ্গানুবাদ আমরা পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছি । প্রকৃত হিন্দুধর্নের সহিত না মিলে, না গাপ খায়, মুসলমানের নমাজে এমন কোন কথাই নাই । খাড়াতির বিচার লইয়াই এত কাল হিন্দু-মুসলমানের ভেদ চণিয়া আসিয়াছে । খাড়াতি লইয়াই হিন্দু-মুসলমান এতকাল পরস্পরকে অস্পৃশ্য মনে করিয়া, ঘৃণা করিয়াছে । এখন আর খাড়াতি সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ থাকিতেছে না । হাবাব আদম সুমাবির গণনার ফলে (Census Report of 1921, vol I, Part I. p. 227) ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে, যে ভারতবাসী মুসলমানেরা প্রায় সকলেই হিন্দুর সম্ভান । কে না জানে, যে হিন্দু-মুসলমানের মিলন ভিন্ন এদেশ, কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক, উন্নতির পাথে একপাও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না ? বস্তুতঃ বর্তমান সময়ে হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের ধর্ম সম্বন্ধে তাহাদের পরস্পরের অজ্ঞানতা ভিন্ন তাহাদের মিলনের পাথে অণুকোন কণ্টকই দৃষ্ট হয় না । একদিকে ইসলাম ধর্নের প্রাণস্বরূপ ‘নমাজ’ যেমন বিশ্বজনীন, যেমন অসাম্প্রদায়িক, যেমন উদার, অপর দিকে হিন্দু ধর্নের প্রাণস্বরূপ বেদমাতা গায়ত্রী ও বিশ্বজনীন, তেমনি অসাম্প্রদায়িক এবং উদার । “তৎ সবিতুর্বরেন্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধियो যো নঃ

প্রচোদয়াৎ” (স্মৃ, ৫-৬২-১০), “যে জগৎসৃষ্টিকর্তা স্বয়ংজ্ঞা ত্রি-
 স্বরূপ পরমেশ্বর অন্তর্ধ্যায়ীরূপে আমাদের বিবেক-বুদ্ধিকে চালনা
 করেন, তাঁহার পূজনীয় জ্যোতি আমরা অন্তরে ধ্যান করি” ।
 নমস্কার ও যেই লক্ষ্য, গায়ত্রীর ও সেই লক্ষ্য । হিন্দু-মুসলমান
 মিলিয়া তবে কেন আমরা সেই ‘নমাজ’ এবং সেই ‘গায়ত্রী’
 যোগে পরমেশ্বরের উপাসনা করিব না ? যদি বুদ্ধিয়া সৃজিয়া
 হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া, আমরা ভক্তির সহিত এই নমাজ এবং
 এই গায়ত্রীর ব্যবহার করি, তবে নিশ্চয় হিন্দু-মুসলমানের
 মিলনের পথ কণ্টক-মুক্ত হইবে, দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত
 হইবে । ভক্তিভরে একত্র মিলিয়া পরমেশ্বরের আরাধনা
 করিলে, যেমন উপাসক-মণ্ডলীর হৃদয় গলিয়া এক হইয়া যায়,
 এমন আর কিছুতেই হয় না । ইহা জানিয়াই, ব্রহ্মসভার প্রতি-
 ষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় ১৮৩০ সনের ৮ই জানুয়ারী তারিখে,
 তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসভাতে, সকলজাতির, সকল শ্রেণীর লোক
 একত্র মিলিয়া, এক অনন্ত পরমেশ্বরের উপাসনা করিবার একটি
 স্থানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন * । ইহা করিয়াই তিনি বিলাত

* “A place of public meeting of all sorts and des-
 criptions of people without distinction as shall behave
 and conduct themselves in an orderly sober religious and
 devout manner for the worship and adoration of the
 Eternal Unsearchable and Immutable Being who is the
 Author and Preserver of the universe.”

Trustees of Ram Mohan's Brahma Sabha.”

